প্রকাশ : ১৩৬৭

প্রকাশক : শ্রীসুরেশ দাশ
ভোলানাথ প্রকাশনী
৩৭।১১ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা—৭০০ ০০৯

মুদ্রক :
শ্যামা প্রেস
শ্রীশিশিরকুমার সরকার
২০বি, ভুবন সরকার লেন
কলিকাতা—৭০০ ০০৭

পূর্ব কথা

সময়টা ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস। একদিন সন্ধ্যেবেলা বন্ধুবর মনঃসমীক্ষক ডঃ গৌর চৌধুরীর বাসায় সপ্তাহান্তের মজলিসে জমাট বেঁধে বসেছি। কথা প্রসঙ্গে ডঃ চৌধুরী বললেন—যাবেন নাকি হিমালয় ভ্রমণে? বললুম—কত দূর? যাচ্ছেন কে কে? কখন? জানা গেল ডঃ গণেশ কর্মকার, সুবোধ চট্টোপাধ্যায় এবং উনি এই তিন জনে মিলে ১৯৮০ সালের এপ্রিল-মে নাগাদ কেদার বদরীর পথে বেরিয়ে পড়বেন মনস্থ করেছেন। আমি বরাবরের ঘরকুণো মানুষ, ঘর ছেড়ে সহসা কোথাও ভ্রমণে বেরোতে মন চায়না, বিশেষ করে একান্ত আপন যারা তাদের সঙ্গে না নিয়ে। তাছাড়া আরও অনেকগুলি কারণও আছে। তার মধ্যে পথের ধকল, টিকিট কাটার হাঙ্গামা, আস্তানার অনিশ্চয়তা, মনের মতো সঙ্গীর অভাব এসব তো আছেই। সত্যি কথা বলতে কী, ভ্রমণের কথা উঠলেই আজকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক স্বর্গতঃ ডঃ গোপেশ্বর পালের কথাগুলি মনে পড়ে যায়। তিনি কদাচিৎ ভ্রমণে বেরোতেন। প্রায়ই তাঁকে বলতে শোনা যেত—কী দেখবে বেড়াতে বেরিয়ে? সেই গাছপালা মাঠঘাট ঘরবাড়ি লোকজন নদীনালা সব জায়গাতেই আছে, কোথাও কম, কোথাও বেশী, কোথাও একরকম, কোথাও আর একরকম, একটু আধটু হেরফের নিয়েই তো বৈচিত্র্য, সুতরাং ঘরে বসেই কল্পনা করে নাও না। ভ্রমণ-কাহিনী পড়, তাতে কল্পনা করতে আরও সুবিধে হবে।

ঈশ্বরের দয়ায় ইতিপূর্বেই সমুদ্র পাহাড় অরণ্য প্রান্তর মরু হ্রদ নগর জনপদ সবই তো দেখা হয়ে গেছে। সুতরাং আর কষ্ট স্বীকার করে নতুন জায়গা দেখার ঝুঁকি নেবার দরকার কী? গেলে তো সেই এসবেরই ভিন্ন আর এক সমাবেশ দেখবো, তার বেশী আর কী? অন্য একটা যুক্তিও এসব ক্ষেত্রে মনের মধ্যে চাড়া দিয়ে ওঠে, কবির ভাষায় তাকে ব্যক্ত করে বলতে পারি—

"বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।"

সত্যি কথা বলতে কী, নিত্য দিনের অতি পরিচিত পরিবেশের মধ্যেই গাছপালা কীটপতঙ্গ পশুপাখির অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা, সূর্যের উদয়াস্তের অপরূপ শোভা, আকাশভরা জ্যোৎস্নার প্লাবন এই রকম আরও কত শত বস্তু এবং ঘটনার মধ্যে যে অন্তহীন বিস্ময় রোমাঞ্চ আর আনন্দ লুকিয়ে আছে তার নাগাল একবার যদি কেউ পেয়ে যায় তাহলে আনন্দের সন্ধানে আর কোথাও তাকে দৌড়োতে হবেনা। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে সাধক শিল্পী মহাপরিব্রাজক বিখ্যাত গ্রন্থ "তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ"--এর লেখক প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। নিজের বুকে হাত রেখে তিনি বলেছিলেন—কোথাও যাবার প্রয়োজন নেই, যা খুঁজে বেড়াচ্ছো তা এখানেই আছে। রামপ্রসাদের কথায়—"ডুব দে রে মন কালী বলে হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।"

তাই গৌরবাবুকে সেদিন স্পষ্টই বলে দিয়েছিলাম আমি তাঁদের হিমালয় ভ্রমণের সঙ্গী হচ্ছি না। কিন্তু যথা সময়ে আমার মতটা বদলে গেল। দেখতে দেখতে ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাস এসে পড়লো। একদিন ডঃ চৌধুরী জানালেন তাঁদের যাত্রার আয়োজন দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে—রেলের টিকিট কাটা হয়ে গেছে, সামান্য কিছু কেনাকাটা মাত্র বাকি। শুনলুম তাঁরা গন্তব্য স্থলের তালিকার কিঞ্চিৎ সম্প্রসারণ করেছেন, অর্থাৎ শুধু কেদার বদরী নয়, গঙ্গোত্রী গোমুখও যাবার ইচ্ছে আছে তাঁদের। গোমুখের কথা শোনা মাত্রই মনের মধ্যে একটা দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলাম। গঙ্গার উৎস গোমুখ, যেখানে যাওয়া

রীতিমত দুঃসাধ্য ব্যাপার, পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। সেই গোমুখে চলেছেন বন্ধুরা! সেই মুহূর্তেই মনস্থির করে ফেললাম—কিন্তু একটা সর্তে। সর্তটা হলো প্রথমেই আমাদের যেতে হবে গঙ্গোত্রী হয়ে গোমুখ, তারপর কেদার বদরী। বন্ধুরা রাজী হয়ে গেলেন। সুবোধবাবু—যিনি তাঁদের তিনজনের টিকিট কেটেছিলেন, তিনিই ভার নিলেন আমারও টিকিট কাটবার এবং দুদিন পরেই জানা গেল টিকিট পাওয়া যাবে। যাবার জন্য তোড়জোড় শুরু করে দিলাম। প্রায় প্রতিদিনই ডঃ চৌধুরীর বাসায় যাতায়াত করছি। সেখানে তাঁর বন্ধু গোবিন্দ সাহার সঙ্গে একদিন দেখা হয়ে গেল। সব শুনে তিনিও চাইলেন আমাদের সঙ্গী হতে। সুবোধবাবু আমার সঙ্গে তাঁরও টিকিট জোগাড় করলেন। কিন্তু যাবার দিন কয়েক পূর্বে জানা গেল, যে সুবোধবাবুর উৎসাহ ও চেষ্টায় এই ভ্রমণ আয়োজন, তিনিই যেতে পারছেন না তাঁর এক পরমাত্মীয়ের হঠাৎ অসুস্থতার জন্য। ভাবলাম—কী আশ্চর্য, যাঁর গোড়া থেকেই যাবার কথা তাঁরই যাওয়া হলোনা, আর যাদের যাবার কোন কথাই ছিলনা তারাই চললো। এমনি হয়। মানুষের হিসেবের সঙ্গে বিধাতা পুরুষের হিসেব সব সময় মেলেনা।

আজ হিমালয় ভ্রমণ শেষ করে ফিরে এসে বুঝতে পারছি, না গেলে কী পরম রত্ন থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে হতো। এর আগেকার আমার সকল ভ্রমণ যে কতো তুচ্ছ কতো অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেছে কেমন করে তা বোঝাবো? হিমালয়ের প্রাকৃতিক শোভা—তার তো কোন তুলনাই হয়না। আর সেই সব মানুষ যাদের দেখা পেলাম হিমালয়ের পথে প্রান্তরে, তারা? তারাও অনুপম। তারা কারা? তাদের মধ্যে ধনী আছে, দরিদ্র আছে, শিক্ষিত অশিক্ষিত আছে, গৃহী আছে, সাধুসন্ন্যাসী আছে, ছন্নছাড়া যাযাবর আছে, সকল রকমের লোকই আছে। তাদের মতো অনেক লোকেরই দেখা মিলবে শহরে গঞ্জে, কিন্তু হিমালয়ের সান্নিধ্যে তাদের যেমন করে পেয়েছি তেমন করে অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। যাদেরই মনের দুয়ারে ধাক্কা দিয়েছি দুয়ার খুলে গেছে। অতি সাধারণ মানুষের মনের গহনে খুঁজে পেয়েছি অসাধারণ সম্পদ, অমূল্য রত্ন। তাদের চিন্তা তাদের অভিজ্ঞতা আমার মনে নতুন ভাবনার নতুন ভাবের জোয়ার

তুলেছে, বিচিত্র উপলব্ধিতে উজ্জীবিত করেছে আমাকে। হিমালয়ের ঐ উদার গম্ভীর শান্ত পরিবেশ ছাড়া মানুষ বোধ করি কখনোই এত সহজ এত সরল এত অকপট হতে পারেনা। কত সম্প্রদায়ের কত মতের কত সাধুসন্ত সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীর দেখা মিললো পথে, কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেলাম মাত্র দুচার জনের সঙ্গে। ক্ষণিকের পরিচয়েই তাঁদের অন্তরের অন্তস্তলে যে প্রচ্ছন্ন আনন্দ প্রবাহের ইঙ্গিত পেলাম, তাঁদের চোখে মুখে যে আনন্দ জ্যোতি প্রত্যক্ষ করলাম, তাঁদের মুখে যে অমৃত বাণী শুনলাম তার সব কিছুই অঙ্গুলি নির্দেশ করছে এমন এক রাজ্যের দিকে যে রাজ্যে অবিচল আনন্দ বিরাজিত।

হৃষীকেশ ছাড়িয়ে যেই ঢুকে পড়েছি হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে সেই মুহূর্ত থেকে আনন্দ আর বিস্ময়ের অনবদ্য এক মিশ্র অনুভূতির মাত্রা ক্রমান্বয়েই বেড়ে চলেছে—নিসর্গ আর মানুষ, বাস্তব আর অলৌকিক সবকিছু মিলে মিশে একাকার হয়ে যাওয়া সে এক বিচিত্র জগৎ! রামকৃষ্ণদেবের সেই গল্প যেন হিমালয়ের কথা ভেবেই বলা—এগিয়ে যাও; প্রথমে পাবে তামার খনি, তারপর রূপোর, তারপর সোনার, তারও পর মণি-মুক্তো-হীরে জহরতের, তারও তারও পর যে ধন পাবে তা তোমার কল্পনারও বাইরে। শুনেছি হিমালয়ের নিভৃত অন্তস্তলে মহাসাধকেরা এখনো রয়েছেন—এতে বিস্মিত হবার কী আছে? সেই নিবিড়তম আনন্দের রাজ্যে একবার পৌঁছে যেতে পারলে কোন অভাব অসুবিধার প্রশ্ন মনের মধ্যে যে আর উঠতেই পারে না।

ভূগোল-পুরাণের ভাষায় গোমুখ থেকে দেবপ্রয়াগ এই পর্যন্ত নদীর নাম ভাগীরথী, তারপর থেকে তাঁর নাম হয়েছে গঙ্গা। কিন্তু মাকে যেমন জননী অথবা মাতৃদেবী বলে ডাকলে প্রাণ ভরেনা, তেমনি গঙ্গাকে আমার আর কোন নামেই ডাকতে মন সরে না। তাই আমার লেখায় সব সময়ই আমি তাঁকে গঙ্গা বলেই উল্লেখ করেছি।

—রমেশ দাশ

সন্ধ্যে সাতটায় ডঃ গৌর চৌধুরীর বাসায় হাজির হোলাম। গোবিন্দবাবুও এসে পড়বেন। তারপর একসঙ্গে তিনজনে মিলে চলে যাবো হাওড়া স্টেশনে। সেখানে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন ডঃ গণেশ কর্মকার। কঙ্কণ কাকলী গৌরবাবুর বাড়ি অবধি এলো আমার সঙ্গে। আমাদের বিদায় জানিয়ে ওরা বাড়ি ফিরে যাবে।

গৌরবাবুকে বিদায় জানাবার জন্য তাঁর বন্ধুবান্ধব প্রতিবেশী পরিজন অনেকেই এসেছেন। সাড়ে সাতটার মধ্যে গোবিন্দবাবুর এসে পড়বার কথা। কিন্তু প্রায় আটটা বাজে, অথচ এখনো তাঁর দেখা নেই। দুন এক্সপ্রেস ছাড়বে ন'টা পঁয়ত্রিশ মিনিটে। ঘণ্টা খানেক আগে স্টেশনে সকলে জড়ো হব এইরকম কথা আছে। দেরী দেখে মনে হলো গোবিন্দবাবু অসুবিধেয় পড়েছেন।

কঙ্কণ কাকলীকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে গৌরবাবু আর আমি বেরোলাম ট্যাক্সির সন্ধানে। ঘর থেকে বেরিয়েছি, ঠিক সেই মুহূর্তে গোবিন্দবাবু ট্যাক্সি নিয়ে হাজির। সঙ্গে তাঁর ছোট ছেলে দীপায়ন। হাওড়া এসে পৌছোলাম ন'টার কিছু পরে। ডঃ কর্মকারের মেয়ে আর নাতিরা অপেক্ষা করছিল স্টেশনে। তাঁর বন্ধু অধ্যাপক সুশোভন ব্যানার্জীও এসেছেন।

কিছুক্ষণ পরে ডঃ কর্মকারও এসে পড়লেন। গাড়ি যথা সময়ে প্লাটফর্মে ঢুকলো। কিন্তু তখনো রিজারভেসন চার্ট টাঙানো হয়নি। হন্তদন্ত হয়ে যাত্রীরা ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিলে—কে আগে গাড়িতে উঠে বসবে তার জন্য রীতিমত হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। কামরার গায়ে আঁটা রিজারভেসন লিস্ট ভালো করে পড়াও যায় না, পড়বার সময়ই বা কোথায়?

দীপায়নের সাহায্য না পেলে আমাদের পক্ষে ঐটুকু সময়ের মধ্যে ঠিক কামরায় নিজেদের স্থান খুঁজে পাওয়া কিছুতেই সম্ভব হতো না।

গাড়ি ছেড়ে দিলে। প্লাটফর্ম পড়ে রইলো পেছনে, পেরিয়ে এলাম রেলওয়ে ইয়ার্ড। গাড়ি প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর ক্রমশ জোরে ছুটতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরেই টের পেলাম ঝড়ের গতিতে আমরা উধাও হয়ে চলেছি। আকাশে চাঁদ নেই। দুপাশের মাঠ-ঘাট নদী-নালা গাছ-গাছালি গ্রামপল্লী সবকিছু আবছা আবছা ঠেকছে। একে আধো অন্ধকার, তায় গাড়ির এই উন্মত্ত গতি। ভালো করে দেখতে না দেখতেই দুপাশের চিত্র নিমেষের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। গাছপালারা যেখানে যেখানে জটলা বেঁধেছে অন্ধকারটা সেখানে যেন আরও গাঢ়। কোথাও কোথাও জোনাকির ঝিকিমিকি সমস্ত জায়গাটাকে যেন রহস্যময় করে রেখেছে।

গাছপালার ফাঁক দিয়ে কখনো কখনো গ্রামের আলো দেখা যায়। শহরের ভেতর দিয়ে কিংবা কিনার ঘেঁষে যাবার সময় চোখে পড়ে বিজলীর আলো। দূর আকাশে ফুটে আছে কয়েকটি তারা, চিত্রপটে আঁকা ছবির মতো। গাড়ি অনেক দূর ছুটবার পর এক-এক জায়গায় জিরিয়ে নিচ্ছে কিছুক্ষণের জন্য। গতির সমুদ্রে বিরতির দু'চারটি দ্বীপ যেন, নাম তাদের ক্ষণিকা!

বেশ লাগছে। এমনিতে তো দুতিন ঘণ্টার যাত্রায় হাঁপিয়ে উঠি। কখন আসবে সেই বাঞ্ছিত স্টেশন তার ভাবনায় মন ছটফট করে, উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় অস্বস্তি বোধ করি। কিন্তু এখন? এখন মন নিরুদ্বেগ, নিস্তরঙ্গ শান্ত স্নিগ্ধ সমুদ্রের মতো। কোন তাড়া নেই, ত্বরা নেই, কখন পৌঁছোবো সেজন্য কোন দুর্ভাবনা নেই। আপিসের কথা বাড়ির কথা বেমালুম ভুলে গেছি—সব কিছু থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে যেন পৌঁছে গেছি এক অনন্ত ছুটির রাজ্যে। বড়ো হাল্কা লাগছে নিজেকে, সারা মন জুড়ে একটা খুশির বাঁশি বেজেই চলেছে।

কামরার ভেতর সবাই বেশ গুছিয়ে গাছিয়ে জাঁকিয়ে বসেছেন, কেউ কেউ বিছানাও পেতে ফেলেছেন এরই মধ্যে। সঙ্গে করে আনা খাবার

খেতে শুরু করেছেন কেউ কেউ। পাশের যাত্রীর সঙ্গে এরই মধ্যে ভাব হয়ে গেছে অনেকের। অদ্ভুত সংসার এই রেলগাড়ি। কতো বিচিত্র মানুষ. কতো ভিন্ন তাদের আচার আচরণ, সংস্কার সংস্কৃতি, অথচ এক নিমেষেই তারা কতো না আপন হয়ে যায়। সবাই তারা জানে তাদের এই পথের দেখা কত অল্প সময়ের জন্য, একটু পরেই তারা আবার পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে—হয়তো বা চিরকালের মতোই। এমনও হতে পাবে আবার যদি কখনো তাদের দেখা হয় তবু একজন আর একজনকে চিনতেই পারবে না। তবু কী আশ্চর্য, এই মুহূর্তের পরিচয়টা তাদের কাছে কত না সত্য, কত না প্রকট, কী ভীষণ জীবন্ত! কেউ কেউ এরই মধ্যে ঠিকানা নিয়ে নিচ্ছেন পরস্পরের পরিচয়টাকে চিরস্থায়ী করে রাখবার মতলবে; অন্য মতলবও থাকতে পারে, যেমন যদি কখনো যাই তোমার দেশে তা হলে কিন্তু ঠাঁই নেবো তোমার ঘরে মনে রেখো, এই রকম আর কী। এরই মধ্যে দেখছি কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে খাবার বিনিময়ও করছেন।

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের ভারি ফুর্তি। চোখের ঘুম কে যেন আজ কেড়ে নিয়েছে। বক্ বক্ বকম্ বকম্ করে বাবা মায়ের সঙ্গে অবিরাম কথা বলে চলেছে তারা, কতো যে প্রশ্ন কতো যে জিজ্ঞাসা তার বুঝি আর অন্ত নেই, সকল প্রশ্নের উত্তরও আছে কি না সন্দেহ।

একেক জন একেক কাজে ব্যস্ত। কেউ আপন মনে বই-এর পাতায় ডুবে গেছেন, কেউ বা দুর্গম তীর্থপথের গল্প বলে শোনাচ্ছেন সঙ্গীদের, কেউ বা কোন্ জায়গায় বিশেষ কী কী পাওয়া যায় তার ফিরিস্তি দিচ্ছেন বন্ধুদের। কেউ আবার ইতিমধ্যেই শয্যার আশ্রয় নিয়ে নাক ডাকাতে শুরু করে দিয়েছেন।

আমার উল্টোদিকের দুটি সংরক্ষিত আসন দখল করেছেন এক নবীনা সন্ন্যাসিনী, আর তাঁর একটি কিশোর ভক্ত। তাঁদের সঙ্গে আছেন এক প্রৌঢ়। মনে হয় একাধারে আশ্রমের অভিভাবক, গোমস্তা, [illegible], সেবক সব কিছুই তিনি। সন্ন্যাসিনীর অঙ্গে উজ্জ্বল গেরুয়া, কিশোরেরও

তাই, কিন্তু প্রৌঢ়ের পরিধানে হাঁটু পর্যন্ত মোটা সাদা ধুতি আর গায়ে হাতকাটা সাদা ফতুয়া। সন্ন্যাসিনী প্রৌঢ়কে বাবা বলেই সম্বোধন করছেন, কিশোরকে ডাকছেন আনন্দ বলে। প্রৌঢ় তাঁকে বলছেন মাতাজী, আর কিশোর বলছে পদ্ম মা। সঙ্গে আছে বেতের চুপড়ি ভর্তি নানা রকম ফল, আর শালপাতায় মোড়া হরেক রকমের শুকনো মিঠাই, সিঁদুর মাখা বেলপাতা আর একরাশ শুকনো ফুল। কুঁজো ভরা জল। কমণ্ডলুও আছে। আলাপ হলো। পদ্ম মা তাঁর দুই ভক্তকে নিয়ে গিয়েছিলেন কামাখ্যা। সেই পুণ্যতীর্থে একমাস কাটিয়ে, কলকাতায় তিন রাত্তির কাটাবার পর এখন ফিরে চলেছেন বারাণসীধামে নিজের আশ্রমে। কলকাতার শিষ্যশিষ্যারা তাঁদের হাওড়া স্টেশনে ট্রেনে তুলে দিয়ে গেছে। কামাখ্যার প্রসাদ মিঠাই দিলেন খেতে। অপূর্ব স্বাদ, তার সঙ্গে ফুলের গন্ধ জড়ানো, বেলপাতারও। বললেন বাবারা যাচ্ছো কোথায়?

গোবিন্দবাবু বললেন -গোমুখের পথে।

শুনে পদ্ম মা খুশিতে ডগমগ হয়ে বলে উঠলেন—কী সুন্দর, কী সুন্দর, চলে যাও সেই অমৃতের উৎসে, আহা সেই গানটা গো, রবিঠাকুরের সেই গানটা—সেই যে "রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি," সেইখানেই তো বলেছেন—"সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে অমর হয়ে রব মরি"। আহা সেখানে পৌঁছে গেলেই বুঝবে ভাবখানা কী।

ভারি সুন্দর লাগলো পদ্ম মার কথাগুলি। গভীর উপলব্ধি না থাকলে এই মুহূর্তে এই কথাগুলি এমন সুন্দর করে তিনি বলতে পারতেন না। পদ্ম মা বয়েসে নবীনা হলে কী হবে, শুধু উপলব্ধিতেই নয়, জ্ঞানেও যে তিনি যথেষ্ট বিশারদ তাঁর কথাবার্তাতেই তা বুঝতে পারলাম।

প্রসঙ্গক্রমে ধর্মের কথা এসে পড়লো। ধর্ম কী? এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর কখনো পাইনি। নানা জনে নানা উত্তর দিয়েছেন, বেশীর ভাগই শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে। তাতে উত্তরটা রীতিমত জটিল এবং দুর্বোধ্য ঠেকেছে। সব চেয়ে সংক্ষিপ্ত উত্তর যা পেয়েছি তা হলো—

যা ধারণ করে তাই ধর্ম। কিন্তু কী সেই বস্তু যা ধারণ করে? এর সদুত্তর অদ্যাবধি পাইনি।

পদ্ম মা বললেন—কেন বাবা, না বুঝবার কী আছে? এই যে বিশাল বিশ্বসংসার, লক্ষ লক্ষ প্রাণী, হাজার হাজার বস্তু সব কিছু নিয়েই তো একটি সংসার। ভেবে দেখ তো, আমাদের সবাইকে এক করলে কে? ভালো করে বুঝে দেখ দেখি। ভালবাসাতেই আমরা এক, হিংসায় বিচ্ছিন্ন। ভালবাসাই আমাদের একের সঙ্গে অন্যকে এঁটে রাখে, অর্থাৎ আমাদের ধারণ করে, বিদ্বেষে আমরা পরস্পরের থেকে স্খলিত হই। যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করে আছেন তাঁকে মা-ই বল আর বাবা-ই বল, তাঁর ভালবাসাতেই আমরা বিধৃত হয়ে আছি। ভালবাসা থেকে আমাদের উৎপত্তি, ভালবাসার মধ্যেই আমাদের পুষ্টি, ভালবাসার ভেতরেই আমাদের পূর্ণতা। তাই ভালবাসাই একমাত্র ধর্ম। ভালবাসাকে শুধু আত্মীয়স্বজনের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে তাকে ছড়িয়ে দাও মানুষ গাছপালা পশুপাখি আকাশবাতাস সবকিছুর মধ্যে, এমনি করেই নিজেকে প্রসারিত কর, সবাইকে ধারণ কর নিজের মধ্যে। বিশ্ব ভুবনকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ কর। এটাই ধর্ম।

গোবিন্দবাবু বললেন—তা না হয় বুঝলাম, মা। কিন্তু সবাইকে ভালবাসা কি সহজ, না সম্ভব? বাঘ কি হরিণকে ভালবাসতে পারে, মানুষ পারে সাপকে ভালবাসতে? হরিণকে ভালবাসলে বাঘ বাঁচবে কেমন করে? সাপকে ভালবাসলে যে মানুষের প্রাণটাই যাবে। যে মানুষ আপনাকে শোষণ করে, আপনার ক্ষতি করে, আপনার অসম্মান করে, তাকে কি আপনার পক্ষে ভালবাসা সম্ভব?

পদ্ম মা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—বড় কঠিন প্রশ্ন করেছো, বাবা। এর রহস্য বুঝতে হলে বোধ হয় তর্কের সাহায্যে তা সম্ভব হবে না, এটা মনে হয় অনুভবের ব্যাপার। কী করে সম্ভব হয় জানি না, তবে জানি মহাবীর আর বুদ্ধ জীবহিংসা ত্যাগ করেছিলেন, পওহারী বাবা শুধু বায়ু সেবন করে জীবন ধারণ করতেন, অনেক মহাপুরুষ বাঘ সিংহ সাপের

সঙ্গে বসবাস করেছেন, আর নিমাই-নিতাই জগাই-মাধাইকে "মেরেছিস কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দিব না ?"—একথা বলে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেছিলেন। আমি এমন এক মহাপুরুষকে জানি যিনি কালব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েও বলতেন—আহা, থাকুক না বেচারা এই দেহটিকে আশ্রয় করে, তারও তো থাকবার জন্য, বিস্তার লাভ করার জন্য একটা আস্তানার দরকার। যে ব্যাধি তাঁর রূপ যৌবন হরণ করে ধীরে ধীরে তাঁকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে নিয়ে চলেছে, তারই প্রতি তাঁর সে কী গভীর প্রেম! কী করে এসব হয় বুঝে নাও।

আনন্দ বললে—পদ্ম মা, তুমি ঠিকই বলেছো। নেকড়ে মায়ের দুধ খেয়ে মানুষের বাচ্চা মানুষ হয়েছে। যীশুখ্রীষ্টকে যারা ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, তিনি তাদেরই জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর পদ্ম মা আবার বললেন—ভালবাসা সহজ কিনা জানি না, তবে ভালবাসা যে সহ-জ অর্থাৎ সহজাত, তাতে তো কোন সন্দেহ নেই, বাবা। দেখ না, শিশু যা দেখে তারই প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাকেই ভালবাসে। অনেক সময় এমনও দেখা যায় সাপের সঙ্গে শিশু খেলা করছে। শিশু ভরত তো সিংহের সঙ্গে খেলা করতো, পড়নি ? পদ্ম মা-র কথাগুলি মানি বা না-ই মানি সেটা স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু এগুলি যে রীতিমত ভাববার মতো কথা সেটা অস্বীকার করি কেমন করে ?

প্রায় সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। মনে হয়, শুধু আমরাই জেগে আছি। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি চোখের পাতা ক্রমশই ভারি হয়ে আসছে, আর বুঝি জেগে থাকা যাবে না। বিছানা পাতাই ছিল। ঘুমের কোলে ঢলে পড়লাম।

কাল রাত্রে অকস্মাৎ এক সময় ঘুম ভেঙে গেল, কারা যেন মৃদু কণ্ঠে গান গাইছে! ঘড়িতে দেখি রাত তখন প্রায় সাড়ে তিনটে। ফিরে দেখি পদ্মাসনে মুখোমুখি বসে পদ্ম মা আর আনন্দ। উভয়েই নিমীলিত আঁখি। একই সঙ্গে মৃদুস্বরে গান গাইছেন—

এলোকেশী দিগ্বসনা
কালী পূরাও মোর বাসনা ॥
যে বাসনা মনে রাখি, তার লেশ মা নাহি দেখি
আবার হবে কি না হবে দশা, বলে দে মা ঠিক ঠিকানা।
যে বাসনা মনে আছে, বলেছি না তোমার কাছে
ওমা, তুমি বিনে ত্রিভুবনে এ বাসনা কেউ জানে না।

ট্রেন ছুটে চলেছে তুর্বার গতিতে। সমস্ত যাত্রীই নিদ্রামগ্ন। আমি খুবই কাছে, তাই বুঝি আমার ঘুম ভেঙে গেছে। দেখলুম ওঁরা তুজনেই প্রায় নিস্পন্দ, ভাবের আবেশে গান গেয়ে চলেছেন। প্রৌঢ়কে দেখতে পেলুম না। মনে মনে শুধু ভাবতে লাগলুম কিসের এই যুগ্ম সাধনা, কী এমন বাসনা যা দিগ্বসনা কালী ছাড়া ঘুণাক্ষরেও আর কাউকে বলা চলে না! ভাবতে ভাবতে আবার চোখের পাতা ভারি হয়ে উঠলো। দ্বিতীয় বার ঢলে পড়লুম ঘুমের কোলে।

ঘুম ভাঙতে জানালার ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখি কী সুন্দর দৃশ্যটি! ট্রেন ছুটে চলেছে উঁচু দিয়ে—নীচে গাছপালার সমাবেশ বরাবর চলে গেছে। তার ওপারে পাহাড়ের পর পাহাড়ের সারি। পাহাড় পর্বত গাছপালা সবাই ছুটে চলেছে গাড়ির সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিয়ে।

চেয়ে দেখি পদ্ম মা আর আনন্দ খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে পাশাপাশি বসে রয়েছেন। তু'জনেরই চোখ বোজা, মুখমণ্ডলে আনন্দের আলো। কিছুক্ষণ

পরে প্রৌঢ় একবার এলেন। খানিকক্ষণ থেকে চলেও গেলেন। যাবার সময় আমার দিকে তাকিয়ে বলে গেলেন—ব্যাস্, হয়ে গেল। সারা দিনে আর কারো মুখে রা'টি শুনবেন না, তাকিয়ে থাকলেও না। ওঁরা তো আর এ জগতে নেই এখন, রস সাগরে ডুব দিয়েছেন। চলি বাবু, বারাণসী এলে আবার এসে ওঁদের নামিয়ে নিয়ে যাবো'খন। চলি।

কত স্টেশন ছাড়িয়ে ট্রেন চলেছে। কী সুন্দর সুন্দর নাম তাদের। মনে হয় নেমে পড়ি, কার কী আছে দেখে নিই, কতো কীই তো শুনেছি ওদের সম্বন্ধে, দেখি না তার কতটা সত্যি, দেখি না এমন কিছু আবিষ্কার করতে পারি কিনা তাদের মধ্যে, আর কেউ ইতিপূর্বে যার কোন সন্ধান পায়নি। কিন্তু চোখের পলকে আসতে না আসতেই তারা মিলিয়ে যায়, তাদের রহস্য আর ভেদ করা হয় না। এগিয়ে চলি। দৃশ্যের পর দৃশ্য ফুটে ওঠে চোখের সুমুখে—আমের বাগান—ডাল ভেঙে আম ধরেছে। গ্রাম ক্ষেত খামার। ধূ ধূ করছে মাঠ জমি। এক ফোঁটাও জলের দেখা নেই কোনখানে। উট ঘোড়া গাধা মাল বইছে। প্রচণ্ড গরম, অথচ সারা অঙ্গ জামা কাপড়ে ঢেকে রেখেছে ছেলেমেয়ে স্ত্রীপুরুষ বুড়োবুড়ি সব্বাই। নইলে গরমের ঝাঁঝ সহ্য করবে কেমন করে? বলদ দিয়ে পাতকুয়া থেকে জল তুলছে। সেই জল মাঠে ঢেলে কোথাও বা শাক সবজি আখ অথবা গমের চাষ চলছে। এক জায়গায় দেখলাম একটা নিঃসঙ্গ ময়ূর বসে। ধূ ধূ মাঠের মাঝখানে বিরাট বড় একজোড়া সারসও বসে আছে দেখতে পেলাম এক জায়গায়।

ঐ যে একটা বিরাট গাছ তার ঘন ডালপালা বিস্তার করে মাঠের ওপর একটি গভীর ছায়া রচনা করেছে। রাখাল রাখালীরা সেই শীতল ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। তাদের পাশে গোরু ছাগলগুলি কেমন নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়ে পড়েছে। গাছ পশুপাখি মানুষ সবাই মিলেমিশে কেমন একীভূত হয়ে আছে এখানে! একই প্রাণের ধারা—*elan vital,* বিচিত্র তার প্রকাশ। Unity in diversity—বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। একং সৎ, বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।

চোখে পড়লো ছুটো শিমূল গাছ, ফুলে ফুলে লাল হয়ে আছে। এ এক অদ্ভুত ধরনের গাছ। যখন পাতা শুধুই পাতা, যখন ফুল শুধুই ফুল, যখন ফল শুধুই ফল। যখন যার তখন তার। ঠিক যেন রম্ভার মতো সতী সাধ্বী। খুব বিশ্বস্ত আর একনিষ্ঠ। কিন্তু শুধু শিমূল কেন, গাছ মাত্রই তো এক আশ্চর্য বস্তু। প্রাণের রাজ্যে একমাত্র গাছই হলো সেই সত্তা যার দেহে বছরে বছরে যৌবন ঘুরে ঘুরে আসে, প্রতি বছরই পুরাতন পাতা ঝরে গিয়ে উদ্গত হয় নতুন কিশলয়, নতুন করে ফুল ফোটে, মৌমাছি প্রজাপতির মতো রসসন্ধানী বন্ধু অতিথিদের আনাগোনা ঘটে, নতুন করে ফল ধরে। আর মানুষ, কিংবা অন্য প্রাণী—তাদের বেলায় যৌবন একবার চলে গেলে আর তা ফিরে আসে না। যদি গাছ হতাম! শুনেছি কায়াকল্প করে যোগী সাধকেরা জীর্ণ দেহে যৌবন ফিরিয়ে আনতে পারেন। কায়াকল্প কি বৃক্ষ-সাধনা?

ঐ যে একটা পায়ে-চলা রাস্তা মাঠের ওপর দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে দূরের ঐ গ্রামটার দিকে। ওটা দেখেই মনে পড়ে যাচ্ছে আর একটি গ্রামের কথা। নামটি তার পিতলকাঁঠি। সেই গাঁয়ে ঢুকবার মুখে রাস্তার মোড়ে একটা ছোট্ট টিলার ওপর, বিরাট সুপ্রাচীন এক গাছের তলায় জয়চণ্ডীর পাষাণ মন্দির। কোঠাবাড়ির মতো দেখতে। সামনে কিছু ধানের ক্ষেত, তাছাড়া চারিপাশে ধূ ধূ করা রাক্ষুসে মাঠ। ঐ রাস্তাটা দেখেই মনে হলো ওটা ধরে এগিয়ে গেলেই বরাবর পেঁাছে যাবো জয়চণ্ডীর মন্দিরে। জানি তা কখনোই সম্ভব নয়, তবু ভাবতে বেশ ভালো লাগছে, মিছিমিছি বিশ্বাস করতে। মনে হচ্ছে, সত্যি সত্যি যেন পেঁৗছে যাবো সেখানে। আরো ভালো লাগছে ভাবতে যে, আমার এই ছুর্গম পথপরিক্রমার শুরুতেই আমার ভাবনা জুড়ে আবির্ভূতা হয়েছেন সর্বভয়বিনাশিনী জগজ্জননী জয়চণ্ডী।

আমাদের ওপাশটায় বসেছে তিনজনের একটি দল—মা, মেয়ে আর মেয়ের কাকা; অবাঙালী। মা আর মেয়ে ভীষণ স্বচ্ছন্দ আর সপ্রতিভ।

অবিরাম কথা বলে চলেছে, তাদের কথার মধ্যে মাঝে মাঝে আমরাও অংশ গ্রহণ করছি। মেয়ের বয়েস চৌদ্দ পনেরোর বেশী নয়, পরণে ট্রাউজার, হাতকাটা জামা। মুখে বাংলা বুলি, মাঝে মাঝে ইংরিজী। ওরা থাকে কলকাতায়। কলকাতায় বিরাট ব্যবসা, তিন-তিনটে বাড়ি—ভাড়া দেওয়া। ভদ্রমহিলা চলেছেন বাপের বাড়ি, ভায়ের বিয়েতে। মেয়ের কলকাতা ছেড়ে আসার ইচ্ছে ছিল না, নিতান্তই বাধ্য হয়ে আসতে হয়েছে। বাঙালী খানা ছাড়া আর কিছুই ভালো লাগে না তার। মাছ না হলে ভাত বা রুটি রোচে না। মায়ের ওপর সে কি দাপট, সব সময়ই তাঁকে ঠুকে ঠুকে কথা বলছে। মামার বাড়িতে মাছ পাবে না, খাবে কী সেই ভাবনায় অস্থির। স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছে। এদিক দিয়ে বংশের মেয়েদের মধ্যে সে-ই প্রথম। মা লেখাপড়া না জানলেও কথায় বার্তায় কিন্তু রীতিমত চৌকস এবং চটপটে। বললুম—যাবো নাকি আপনার ভায়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে ? ভদ্রমহিলা এক কথায় রাজী। প্রায় বিশ্বাসই করে ফেললেন আমার কথা এবং তাঁদের সঙ্গে নেমে পড়তে রীতিমত পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। অনেক কষ্টে তাঁকে শান্ত করা গেল।

বেলা গড়িয়ে বিকেল হলো। দ্রুত গতিতে সূর্য এগিয়ে চলেছে পশ্চিম দিগন্তের দিকে। বিরাট সূর্য। রথের চাকার মতো। সিঁদুরের মতো টকটকে লাল। সারা পশ্চিম আকাশ লালে লাল হয়ে গেছে। একটা ছোট্ট বনস্থলী চোখে পড়লো। গাছপালাগুলো অস্তসূর্যের রক্তচ্ছটায় ঝলমল করে জ্বলছে, পেছনের সমস্ত আকাশটা জুড়ে যেন আগুন লেগেছে। বনের ওপারে একটা পাহাড়ের চূড়োয় ছোট্ট একটা মন্দির। কী সুন্দর লাগছে দেখতে! যদি সো-জা চলে যেতে পারতাম তাহলে কতটুকুই আর সময় লাগতো ঐ মন্দিরে গিয়ে পৌঁছোতে ?

কিন্তু সোজা যাবার তো উপায় নেই, যেতে হবে এঁকেবেঁকে, গাছ-পালা নদীনালা ঘরবাড়ি সবরকম বাধাবন্ধ এড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে একটা বিরাট সত্যের উদ্ভাস ঘটলো, বহুদিনের অমীমাংসিত এক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম। জীবন পথে সোজা হয়ে চলতে গেলে মানুষকে

কেন এত কষ্ট পেতে হয় এতদিন তা বুঝতে পারিনি। এখন মনে হলো হবেই তো। সোজা পথে, অর্থাৎ নাক বরাবর ঐ মন্দিরে যদি পৌঁছোতে চাই তাহলে পদে পদে ধাক্কা লেগে আঘাত খেতে হবে না? জীবন পথেও যে তেমনি ঘটবে এতে আর অবাক হবার কী আছে? আরো মারাত্মক সত্য যা বুঝতে পারলাম তা হলো—একেবারে সোজা পথে কখনোই হাঁটা যায় না, পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে না চললে চলাই যাবে না, থমকে থেমে থাকতে হবে। পুরোপুরি সোজা পথে যেমন হাঁটা যায় না তেমনি আবার সব সময় মাথা উঁচু করেও চলা যায় না, কোথাও কোথাও মাথা নীচু করতে হয়, নইলে মাথাটাই খোয়া যাবার সম্ভাবনা। তাহলে কি সোজা পথে চলবো না? চলবো না মাথা উঁচু করে? সোজা পথে নিশ্চয়ই চলবো, তবে অন্যকে আঘাত না হেনে, অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ণ না করে। মাথা নিশ্চয়ই উচু রাখবো, তবে প্রকৃত মহত্ব যেখানে দেখবো, সেখানে অবনত হব, বিনম্র হব। সোজা হয়ে চলার মানে অন্যকে গুঁড়িয়ে অবজ্ঞাভবে তুচ্ছ করে চলা নয়, গোঁয়াতুর্মি আর ঔদ্ধত্যের নাম মাথা উঁচু করে রাখা নয়। মনে পড়ে গেল মণ্ডলগ্রামের তন্ত্র-সাধক পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কথাগুলি—চলতে গেলেই পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা লাগবে। এটাই নিয়ম। সুতরাং কারো সঙ্গে তোমার মতের গরমিল হবে না, কেউ তোমার বিরোধিতা করবে না, সকলেই তোমার কথা মেনে চলবে, এক কথায় তোমার জীবন নদীটি মন্দাক্রান্তা ছন্দে পরম নিশ্চিন্তে বয়ে চলবে এ হতেই পারে না, এ রকম আশা করাটাই ভুল। শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে একজন বলেছিলেন—বিরোধিতা হোক আপত্তি নেই, কিন্তু সব চাইতে যা বেশী করে পীড়া দেয় তা হলো অভব্য বিরোধিতা, বিরোধীদের মুখে নীচ এবং রুচিহীন অশ্লীল মন্তব্য। তন্ত্রাচার্য বললেন—আরে, সেটাই তো স্বাভাবিক, যে তোমার বিরোধিতা করবে সে তো তোমার নিন্দে করবেই, আর নিন্দেই যখন করবে তখন কি ভালো ভালো কথায় তোমাকে ভূষিত করবে নাকি? তাছাড়া যার চরিত্র যেমন সে তো সেই ভাবে অন্যের সম্পর্কে মন্তব্য করবে। সাপের মুখ থেকে কি কখনো মধু ঝরে? তুমি যদি শেয়ালের

মুখে কোকিলের গান শুনতে চাও তাহলে দোষটা কার? তোমার, না শেয়ালের?

তিনি আরও বলেছিলেন, পথচলার আর একটা নিয়ম হলো, চলতে গেলে তুমি যে শুধু একবার দুবার বাধা পাবে তা নয়, অর্থাৎ একটা বাধা অতিক্রম করার পর তুমি যদি ভাবো তোমাকে আর কোন বাধার সম্মুখীন হতে হবে না, তাহলে তুমি মারাত্মক ভুল করবে। সত্যি কথা বলতে কী, সমস্যা ছাড়া জীবন হতেই পারে না। একটা সমস্যার সমাধান করেছো কি অমনি আরও দশটা সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। এটাই নিয়ম। সুতরাং সব সময়ই নতুন নতুন সমস্যার জন্য তৈরী থাকবে। অনেকগুলো সমস্যা যদি একসঙ্গে এসে পড়ে ঘাবড়ে যেও না, একটা একটা করে তাদের মোকাবিলা কর, দেখবে সব সমস্যারই সমাধান হয়ে গেছে। তোমার অতীত জীবনের এমন কোন সমস্যার কথা বলতে পারো কি, যার কোন না কোনভাবে সমাধান হয়ে যায়নি? সুতরাং সমস্যার কল্পনায় মুহ্যমান হয়ে থেকো না, আনন্দের সঙ্গে এগিয়ে চল, চরৈবেতি।

এখন আরও একটা সত্য উদিত হলো মনের মধ্যে। চলার পথে যার সঙ্গে আমার ধাক্কা লাগছে তাকে এবং আমাকে দুজনকেই সম্মুখে এগিয়ে যেতে হবে। তাই কখনো আমাকে, কখনো তাকে, কখনো বা দুজনকেই একপাশে সরে দাঁড়িয়ে অন্যের জন্য পথ করে দিতে হবে। পথ চলার এটাই নিয়ম। এরই নাম সঙ্গতি সাধন (adjustment)। আর এক নাম আপোশ (compromise)।

দিন ফুরোলো, সন্ধ্যে হলো। সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত্তির নামলো। গাড়ি চলেছে ছুটে উদ্দাম উন্মত্ত গতিতে। অদূরে বসে আছেন এক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা, উত্তরপ্রদেশবাসী। সারল্য, সৌন্দর্য আর শান্তির প্রতিচ্ছবি। দুজনে এবার শুয়ে পড়বেন, তার আয়োজন করছেন। শোবার আগে করজোড়ে বৃদ্ধা প্রণাম জানিয়ে সুরেলা কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন—

"কোই পার্ লে চলে ঝাঁঝ্রি নাও অব্ হামারি"

আমারও দুচোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। আর বসে থাকতে পারছি না।

হরিদ্বার এসে পৌঁছোলুম সাত সকালে, ঠিক সকাল সাতটায়! হরিদ্বারে এবেলা আর ঢুকবো না, ওবেলা আসা যাবে, গৌরবাবু বললেন। আগে যাবো হৃষীকেশ। জানা ছিল না, এটাই যখন মনে ছিল তখন একেবারে হৃষীকেশের টিকিট কেটে হাওড়াতে হৃষীকেশের বগিতে চড়ে বসলেই হতো। যাক্‌গে, গৌরবাবু আর গোবিন্দবাবু গেলেন হৃষীকেশের টিকিট কাটতে, আমি আর ডঃ কর্মকার রইলাম মালপত্তরের জিম্মায়।

প্লাটফর্মে দেখলাম একগাদা বানর বসে আছে—শিশু বানর মাকে জড়িয়ে আছে শক্ত করে। সঙ্গে আনা একরাশ পাঁউরুটি থেকে কয়েকটা নিয়ে ওদের দিকে টুকরো টুকরো করে ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন ডঃ কর্মকার। আশ্চর্যের কথা, হুটোপুটি না করে অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে তারা ছুঁড়ে দেওয়া রুটির টুকরোগুলো একে একে এসে নিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে একজন ইউরোপীয় নবীন সন্ন্যাসী– সর্ব অঙ্গ, মায় মুখ পর্যন্ত গেরুয়ায় ঢাকা—আমাদের সামনেই একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়লেন ধ্যান করতে। মাঝে মাঝে তাঁর মুখের আবরণটুকু হাওয়া লেগে উড়ে উড়ে যাচ্ছিল, আর সেই ফাঁকে ফাঁকে ঝিলিক দিয়ে উঠছিল তাঁর সোনার অঙ্গের উজ্জ্বল দ্যুতি।

আটটা চল্লিশে হৃষীকেশের ট্রেন ছাড়লো। দুটো লম্বা লম্বা টানেল পেরিয়ে গেলাম। কিছুটা জায়গা বাংলামুলুকের মতো সুজলা শ্যামলা। তারপরই শুরু হলো প্রচণ্ড রুক্ষতা। দুপাশে বন। বনের পাশ দিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে। বড় বড় গাছ—শাল আর সীসম। কিন্তু প্রচণ্ড গ্রীষ্মের তাপে গাছপালা সব জ্বলে পুড়ে ঝল্‌সে গেছে। কয়েকটা স্টেশন ছাড়িয়ে এসে পড়লাম হৃষীকেশে।

হৃষীকেশ—হিমালয়ের পাদপীঠ! অবিচ্ছিন্ন শৈলমালা। তারই পাশে ছোট্ট শহর হৃষীকেশ। পাশেই গঙ্গা বয়ে চলেছেন। গঙ্গার জল

কাকচক্ষুর মতো স্বচ্ছ কালো। গঙ্গা খুব প্রশস্ত নয়, কিন্তু দুরন্ত ঢেউ আছে জলে। ওপারে বন—নাম-না-জানা সারিবদ্ধ বৃক্ষশ্রেণী, তাদের সতেজ সবুজ রঙের ছোয়ায় চোখ জুড়িয়ে যায়। তারও পরে হিমালয় গিরিশ্রেণী আকাশে ঢেউ-এর পর ঢেউ তুলে অনন্তে বিলীন হয়ে গেছে। এপারে ধূ ধূ করছে সাদা চওড়া বালিয়াড়ি। বালিয়াড়ির প্রান্তে পাড়ের ওপর গাছপালার জটলা। বিরাট দুটি অশ্বত্থ আর বট গভীর ছায়া ফেলেছে জমিব ওপর, দেব-দেবীর মন্দির, একটি কালীমন্দিরও আছে। গাছের তলায় মন্দির প্রাঙ্গণে সাধু সন্ন্যাসীদের জমায়েৎ।

গঙ্গায় স্নান করলাম। সমস্ত দেহ মন জুড়িয়ে গেল। প্রথমে জলটা এমন ঠাণ্ডা লাগলো যে মনে হলো স্নান বুঝি বা করতেই পারবো না, কিন্তু শেযে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে জল ছেড়ে আর উঠতেই ইচ্ছে করছিল না।

রাশিকৃত ফুল আর ফুলের মালা ভেসে চলেছে গঙ্গার স্রোতে। কেউ কেউ খাবার ছুঁড়ে ফেলছেন জলে, আর সঙ্গে সঙ্গে পাখ্না ভাসিয়ে দলে দলে বিবাট বিরাট মাছ প্রবল বেগে স্রোতের উজান বেয়ে তেড়ে আসছে খাবারের লোভে।

প্রদীপ জ্বেলে পাতার ঠোঙায় করে মাঝে মাঝে ভক্তেরা ভাসিয়ে দিচ্ছে স্রোতের জলে, ঢেউ-এর দোলায় দুলতে দুলতে সারি সারি জ্বলন্ত প্রদীপ ভেসে চলেছে কত সে দূরে, কোন্ সুদূরে, কে জানে সে কোন্খানে। একটি মেয়ে জলে ডোবা পাথরগুলোর তলা থেকে হাতড়ে হাতড়ে অদ্ভুত কায়দায় আর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সিকি আধুলি সংগ্রহ করে আঁচলে ভরে রাখছে।

বিকেলে গোবিন্দবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে টাঙ্গা চড়ে মাইল দুয়েক পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে হাজির হোলাম খেয়াঘাটে। তারপর লঞ্চযোগে গঙ্গা পেরিয়ে পৌছে গেলাম গীতা-ভবনে। ভেবেছিলাম গীতা-ভবনে রাশ রাশি গীতা থাকবে, কিন্তু না, এর নাম গীতা-ভবন কারণ নিয়মিত এখানে গীতার আলোচনা হয়। পণ্ডিত কথক গীতার বিভিন্ন অধ্যায় ব্যাখ্যা করেন, আর শত শত মানুষ প্রাঙ্গনে বসে দাঁড়িয়ে তাই শোনে। গীতা-ভবনে বহু

দেবদেবীর মন্দির এবং কিছু কিছু দোকানদানিও আছে। মন্দির গাত্রে মহাভারতের বিবিধ উপাখ্যানের চিত্র আঁকা। অসংখ্য যাত্রীর ভিড়, বেশীর ভাগই এদেশী মহিলা—উজ্জ্বল রঙের শাড়িতে সর্বাঙ্গ মোড়া, গঙ্গার কিনার বরাবর যেন জ্বলন্ত রঙের বন্যা ছুটেছে।

গীতা-ভবনের পর গেলুম লছমনঝোলা (লছমনঝুলা)। গীতা-ভবনে যেতে হলে এপারে যে জায়গায় নামতে হয় সেই পর্যন্ত টাঙ্গা আসে, তারপর লছমনঝোলা অবধি এগিয়ে যেতে হলে ট্যাক্সির সাহায্য নিতে হয়। ট্যাক্সি করে যখন লছমনঝোলা পৌছোলুম তখন প্রায় বিকেল পাঁচটা।

কিন্তু কই, ঝুলা কোথায়, নদীই বা কোথায়? পাহাড় ঘুরে ঘুরে বেশ কিছুক্ষণ চলার পর নদীর ধারে এসে পড়লুম। ঐ তো ঝুলা দেখা যাচ্ছে। ঝুলা অর্থাৎ সাঁকো। সেই ছোট্ট বেলা থেকেই লছমনঝোলার স্বপ্ন দেখে আসছি। মনে মনে ছবি এঁকেছি তার কত। দুই পাহাড়ের সঙ্গে বাঁধা দড়ি কিংবা তারের সংকীর্ণ এক সেতু, হাঁটতে গেলে দোলে, পা ফেললে কাঁপে, সন্তর্পণে চলতে না পারলে অতল তলে নদীর জলে তলিয়ে যাব।

কিন্তু কই, সে সব কোথায়? বালীগঞ্জের লেকের সেতু যে এর চাইতেও অনেক বেশী রোমাঞ্চকর। নদীর দুপারে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো উঁচু ভিত। ভিতের ওপর দুদিকে দুটি দুটি করে লোহার থাম। পেছন দিক থেকে থাম দুটিকে শক্ত করে টেনে রেখেছে মোটা মোটা তারের দড়ি। এপারের দুটি থামের সঙ্গে ওপারের দুটি থাম মোটা তারের রশি দিয়ে বাঁধা। সেই রশি থেকে ঝুলছে আরও অনেক তারের দড়ি যার সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে পরস্পরের সঙ্গে গাঁথা অনেকগুলো তক্তা—অর্থাৎ সব কিছু মিলিয়ে একটি suspension bridge। বেশ চওড়া, সিমেন্ট দিয়ে শক্ত করে আঁটা, তাই ওপর দিয়ে হাঁটতে ভয়ও করে না, হাঁটলে সাঁকো নড়েও না, চড়েও না।

ঝুলা দেখে মন ভরলো না, কিন্তু ওপারের পাহাড়ের কোলে তেরো-তলা মন্দিরটি দেখে আর সেই মন্দির-চূড়োয় উঠে নদীর যে অপরূপ রূপরাশি

চোখে পড়লো তাতে সমস্ত খেদ এক নিমেষে উবে গিয়ে সারা মন ভরে উঠলো এক অনির্বচনীয় আনন্দের উপলব্ধিতে।

ফিরবার সময় সন্ধ্যে নামলো। নীচে নদীর কিনার ঘেঁষে মন্দিরে মন্দিরে আলোর মালা। দেখে মনে হয় যেন গঙ্গার জলে ফুটে উঠেছে অগুনতি তারা—পাতাল গঙ্গায় যেন লক্ষ লক্ষ তারার ফুল ভাসছে।

যে ধরমশালায় উঠেছি তার ম্যানেজার মিঃ মদন আগে মিলিটারী সার্ভিসে কাজ করতেন। সজ্জন ব্যক্তি—হৃদয়বান অথচ নিয়ম-নিষ্ঠ। বই লিখেছেন কয়েকটি। প্রধান বইটি মনের অশান্তি কেমন করে জয় করা যায় সে সম্বন্ধে। মূল বক্তব্য—স্বাস্থ্য-বিধি মেনে চল এবং কয়েকটি নিয়ম মেনে চল, যেমন ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবে না, সব সময় কোন না কোন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, প্রাণ ভরে হাসবে, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। একটা জায়গা বেশ ভাল লাগলো। লেখক বলছেন : দুশ্চিন্তা কেন? হয় বাঁচবে, নয় মরবে। যদি বাঁচো তাহলে দুর্ভাবনার কোন কারণ নেই। যদি মর তাহলে হয় স্বর্গে নয় তো নরকে যাবে। যদি স্বর্গে যাও তাহলে তো দুশ্চিন্তার কোন হেতু নেই, আর যদি যাও নরকে তাহলে সেখানে এত বেশী লোকের সঙ্গে তোমাকে করমর্দন করতে হবে যে তুমি দুর্ভাবনার জন্য কোন সময়ই পাবে না। সুতরাং মা শুচ, ত্যাগ কর সর্ব রকমের দুর্ভাবনা আর দুশ্চিন্তা।

মিঃ মদন আমাদের একটা বড় ঘর ছেড়ে দিয়েছেন। সাধারণতঃ তিনদিনের বেশী এখানে থাকার নিয়ম নেই। ধরমশালায় শুধু থাকার ব্যবস্থা আছে। খেতে হবে বাইরে। অবশ্য ইচ্ছে করলে কেউ এখানে নিজে রান্না করে খেতেও পারেন।

হৃষীকেশ দুধছানা ক্ষীর ননী সন্দেশের দেশ। দোকানে দোকানে বিরাট বিরাট কড়াই ভরা দুধে অবিরাম জ্বাল দেওয়া হচ্ছে। ভারি সুন্দর লস্যি

মেলে। এক গ্লাস খেলেই প্রাণ জুড়িয়ে যায়। দাম মাত্র দেড় টাকা। মুখরোচক আচারও মেলে হরেক রকম। বারো টাকা কিলো দরে যে আচারটি কিনলাম, সত্যি সেটি চমৎকার। সব্জির বড়ো অভাব—ডাল আলুই প্রধান। বেগুন, কুমড়ো (কাশীফল বা লাউকা) দিয়ে তরকারী কিছু কিছু হোটেলে পাওয়া যায়। যে হোটেলখানা আমরা বেছে নিয়েছি তার মালিকটি বিনয়ের অবতার, হাত কচলে সব সময়ই বলে চলেছে—ইয়ে দুকান আপ্কা, হুকুম কিজিয়ে সেবা লিজিয়ে। হৃষীকেশ শহরটি এখনো তেমন জনবহুল হয়ে ওঠেনি—এখনো নির্মল প্রশান্তির একটি হালকা আমেজ তাকে জড়িয়ে আছে। পথে অনেক হিপীর সঙ্গে দেখা হলো। কিন্তু এক জায়গায় দেখলাম একটি হিপী আর তার হিপিনী, সঙ্গে একফোঁটা বাচ্চা একটা মেয়ে। বাপ-মায়ের সঙ্গে তার তফাৎ—তারা আগে সংসারী ছিল তারপর হিপী হয়েছে, কিন্তু সে জন্ম নিয়েছে হিপী হয়েই।

বেলা আড়াইটে নাগাদ গোবিন্দবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম হরিদ্বারের উদ্দেশ্যে। ডঃ কর্মকার আর ডঃ চৌধুরী হৃষীকেশেই রয়ে গেলেন। হরিদ্বার—আমার শৈশবের স্বপ্ন! কতো কথা শুনেছি তার সম্বন্ধে, কতো ছবি এঁকেছি তার মনে মনে—এপারে পাহাড়, ওপারে পাহাড়, মধ্যিখানে উদ্দাম উত্তাল গঙ্গা। জলে নামে কার সাধ্যি— তোড় এতোই প্রবল। এপারে জলের কিনার ঘেঁষে মন্দিরের পর মন্দির চলে গেছে। শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি শোনা যায় অবিরাম। পাহাড়ের ওপর থেকে মাঝে মাঝে নেমে আসেন সাধুর দঙ্গল। ঝোপড়ি বেঁধে এখানে ওখানে সাধুরা বসে গেছেন ধ্যান করতে। এই ছিল আমার ধ্যানের হরিদ্বার। কিন্তু সত্যি সত্যি হরিদ্বারে এসে আমার সাধের স্বপ্নটি ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। মনে হলো ইয়ারো না দেখাই ছিল ভালো। বাড়তে বাড়তে হরিদ্বার আজ একটা বিরাট শহরে পরিণত হয়েছে—মানুষজন দোকানবাজারে থৈ থৈ করছে সারা শহর। হর্কী প্যারী, যার এতো নাম, দেখে মনে হলো মাড়োয়ারী কৃষ্টির প্রখর চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বলতায় উৎকট বর্ণবাহুল্য আর কৃত্রিমতার একটি নিদর্শন মাত্র। হাজার হাজার লোকের মেলা বসে গেছে যেন।

গোবিন্দবাবু বললেন কংখল (কন্‌খল) যেতে রাজী আছি কিনা। কংখল! নামের মধ্যেই সংগীতের ব্যঞ্জনা। চলুন যাই কংখল। রিক্সো ছুটলো পাঁচ কিলোমিটার দূরে কংখলের পথে। ভাবলুম হরিদ্বার ছাড়িয়ে, নদীনালা ডিঙিয়ে, ক্ষেতখামার পাহাড় প্রান্তর পেরিয়ে তবে যেতে হবে কংখলে। কিন্তু না, হরিদ্বার শেষ হতে না হতেই পৌঁছে গেলুম কংখলে। হরিদ্বার আর কংখলের মধ্যে ছেদ নেই এতটুকু। অনেকটা জায়গা জুড়ে মন্দিরের চত্বর। এখানেই দক্ষ রাজার রাজধানী ছিল। এখানেই মহাদেব সতীহারা হয়ে দক্ষযজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিলেন প্রচণ্ড ক্ষোভে আর আক্রোশে।

পাশ দিয়ে বয়ে চলেছেন গঙ্গা, যাঁর স্থানীয় নাম নীলধারা। কী সুন্দর নামটি! ধারাটিও নীলাভ! বাঁধানো সিঁড়ি নেমে গেছে জলে। এটিই সতীঘাট। বড় বড় গাছ ছায়া ফেলেছে সোপান শ্রেণীর ওপর। ঠিক এই রকম একটা জায়গা দেখেছিলুম কটকে মহানদীর তীরে। কিন্তু এমন হয় কেন? কেন একটা জায়গা দেখলে আর একটা জায়গার কথা মনে পড়ে, কেন মনে পড়ে যায় একজনকে দেখলে অন্য আর একজনকে? মনোবিজ্ঞানীরা অনেক রকম ব্যাখ্যা দেবেন। তাঁরা বলবেন গুণগত সাদৃশ্য বা বৈপরীত্য, অথবা স্থান বা কালগত সান্নিধ্য কিংবা পারম্পর্য এর কারণ হতে পারে—যার জন্য যমজদের একজনকে দেখলে আর একজনকে মনে পড়ে, শীতের কথা ভাবলে গ্রীষ্মের ভাবনা মনে আসে, দোয়াতের চিন্তা মনে এলে কলমের চিন্তাও মনে এসে যায়, বিদ্যুতের ঝলকানি চোখে লাগলেই কান তৈরী হয় বজ্রের ধ্বনি শোনার জন্য। বুঝলাম। কংখলের দক্ষ প্রজাপতির মন্দিরের এই অঞ্চলটার সঙ্গে কটকের মহানদীর তীরবর্তী ঐ জায়গাটার বেশ একটা মিল আছে।

কিন্তু "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে" ভক্তের যখন এ ধরনের অভিজ্ঞতা হয় তখন মনোবিজ্ঞানী কেমন করে তার ব্যাখ্যা করবেন? তাঁর দেওয়া উল্লিখিত কোন ব্যাখ্যাই যে এক্ষেত্রে খাটবে না, কারণ ভক্তের দৃষ্টি যে তখন তরঙ্গে আবদ্ধ না থেকে চলে গেছে মহাসিন্ধুতে,

শিখাকে অতিক্রম করে পৌঁছে গেছে হুতাশনে, প্রকাশের আবরণ ভেদ করে খুঁজে পেয়েছে প্রকাশিতকে। আহা, কবে আসবে সেই দিন যেদিন বলতে পারবো—যেখানেতে পড়ে আঁখি সেখানেই কৃষ্ণ দেখি? তেমন দিন সত্যি কি কখনো আসবে?

দক্ষেশ্বর মহাদেবের মন্দির চত্বরের মর্মর পাথরে গড়া বৃষভ মূর্তিগুলি হঠাৎ দেখলে জীবন্ত বলে ভ্রম হবে। জায়গাটির পৌরাণিক গুরুত্বও যথেষ্ট। শ্রাবণ মাসে এবং শিবরাত্রিতে এখানে প্রচুর ভক্তসমাগম হয়।

হরিদ্বারে ফিরে পাহাড়ে ওঠার লাঠি কিনলুম চারটে। দোকানের মালিক এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। তাঁর কারবার শুধু লাঠির। তিনি বেশ যত্ন করে আমাদের লাঠিগুলিকে ঠিকঠাক করে দিলেন। তাঁর ছোট্ট মেয়েটি সব সময়ই তাঁর কাছে বসে তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করতে লাগলো।

সকাল সাড়ে পাঁচটায় পৌঁছোতে হবে বাসস্ট্যাণ্ডে। গোছগাছ করতে সময় লাগবে। তাই রাত সাড়ে তিনটেয় উঠে পড়েছি সবাই। বাঁধাছাঁদা হয়ে গেল। হাতে এখনো কিছু সময় আছে। ধরমশালার ব্যাল্‌কনিতে গিয়ে দাঁড়ালাম—যাবার আগে হৃষীকেশের গঙ্গাকে আর একবারটি দেখে নেব বলে।

গঙ্গাস্নানে অল্প কয়েকজন স্ত্রীপুরুষ চলেছেন, কিছু কিছু সন্ন্যাসীও। গাদা গাদা সাধু দেখেছি হরিদ্বার আর হৃষীকেশে—সবাইকে দেখে মনে হয়েছে নিতান্তই সাধারণ, একেবারে আটপৌরে। নিজেকে অনেকবার প্রশ্ন করেছি—কেন এঁরা সংসার ছেড়ে এসেছেন, যদি এমনি করেই দিন কাটাতে হবে? পরম প্রাপ্তি সহজ নয় জানি, কোটিতে একজনেরও সে প্রাপ্তি ঘটে কিনা সন্দেহ, কিন্তু সেই অনন্তের কণামাত্র পেলেও যে চোখে

মুখে তার উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটতে বাধ্য। এঁদের কারো মধ্যেই তো তেমন কিছু দেখতে পেলাম না। হয়তো আমারই সে দৃষ্টি নেই—দেখতে জানলে সব কিছুর মধ্যেই নাকি তাঁকে দেখা যায়। আবার সমর্থ সাধুরাও অনেক সময় নিজেদের গোপন করে রাখেন। রামদাস কাঠিয়াবাবার বহিরঙ্গ ব্যবহারে হতাশ হয়ে ভাবী শিষ্য তারাকিশোর যখন বিমূঢ়, তখন কাঠিয়াবাবা তাঁকে শুনিয়ে বলেছিলেন—

"বাবা! হাতীকা দো দাঁত রহতা হ্যায়, এক বাহার দেখানে কি, দোস্‌রা ভিতর অপ্‌না খানে কি, ভিতরকা দাঁত দুস্‌রাকো মালুম নাই পড়্‌তা হ্যায়। শান্তনকাবি এয়্‌সা দো বৃত্তি রহতা হ্যায়। এক বাহার দেখানে কি, দুসরা আপনা ভিতর কি; উস্‌কা খবর কিসিকো নেহি মিল্‌তা হ্যায়।"* সুতরাং তাঁরা কৃপা করে যদি নিজেরা ধরা না দেন তাহলে তাঁদের নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়—অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা হয় সেটা হলো তাঁরাও থাকেন আত্মগোপন করে, আর আমরাও আমাদের স্থূল দৃষ্টি দিয়ে পারিনা তাঁদের আসল রূপটি উদ্ঘাটন করতে।

হঠাৎ দেখি গঙ্গাস্নান করে এক দীর্ঘকায় শ্বেতশ্মশ্রু পক্বকেশ প্রবীণ সাধু ফিরে চলেছেন; কৃশ কৃষ্ণাঙ্গে রক্তবর্ণ গেরুয়ার আলখাল্লা পরা, হাতে লম্বা লাঠি, সঙ্গে দুজন বৃদ্ধ শিষ্য! যে তাঁকে দেখছে সেই-ই নম্র প্রণাম জানিয়ে শ্রদ্ধাভরে বিদায় নিচ্ছে। উল্টোদিক থেকে একজন শঙ্করপন্থী দণ্ডী সন্ন্যাসী আসছিলেন গঙ্গার দিকে। বৃদ্ধ সাধুকে দেখে তিনি আনত হয়ে তাঁকে প্রণাম জানাতে গেলে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী নিজেই নত হয়ে তাঁকে প্রণতি জানিয়ে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। অনেকক্ষণ ধরে দুজনের মধ্যে কী সব আলাপ আলোচনা চললো। তখনো ভালো করে দিনের আলো ফোটেনি। পথ প্রায় নির্জন। আলাপন শেষে দুজনে চলে গেলেন দুদিকে, যে যাঁর নির্ধারিত পথে।

* শ্রীতারাকিশোর শর্মা চৌধুরী লিখিত "শ্রী ১০৮ রামদাস কাঠিয়া বাবাজী" দ্রষ্টব্য।

যথা সময়ে আমরা চারজনে স্ট্যাণ্ডে এসে চড়ে বসলাম গঙ্গোত্রীর বাসে। সাড়ে ছ'টায় বাস ছাড়লো। হৃষীকেশে হিমালয় দেখে ভাবতেই পারা যাবে না হিমালয় কী বিরাট, কী গহন! প্রচণ্ড গর্জন করে ঘুরতে ঘুরতে বাস পাহাড়ের ওপরে, ক্রমান্বয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। অনেকক্ষণ ধরে হৃষীকেশ বার বার আমাদের চোখে পড়তে লাগলো, তারপর ক্রমশ ছোট হতে হতে একসময় আর তাকে দেখাই গেল না। যেদিকে তাকাই শুধুই পাহাড়। পাশাপাশি, ওপরে নীচে, মুখোমুখি, সামনে পেছনে শুধুই পাহাড়ের সমারোহ। কোনটা আকাশ ছুঁয়েছে, কোনটা বা তুলনায় একটু খাটো, হয়তো বা দূরত্বের জন্যই। পথের একপাশে গভীর খাদ, গঙ্গার প্রবাহ, ঝর্ণার জলধারা, বড বড় গাছের গভীর বন—আর একপাশে খাড়াই পাহাড়, বাসের জানালা দিয়ে কতটা উঁচু বুঝবার জো নেই।

পাহাড় কোথাও বনাচ্ছন্ন—বনপথ দিয়ে বাস ছুটেছে, কোথাও বা পাহাড়ে কোন গাছপালা নেই বললেই চলে—শুধু ফণী মনসা, সিসল, সর্পগন্ধা আর সিংহের কেশরের মতো লম্বা লম্বা হলুদ রঙের ঘাসের গুচ্ছ প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আছে শক্ত পাহাড়কে। দু-একটা বেঁটে বেঁটে গুলমোহর গাছ ফুলে ফুলে আলো হয়ে আছে। কোন কোন পাহাড় ছেয়ে আছে সরু সরু কালো কালো গুঁড়িওয়ালা গাছে, তাদের ফিকে রঙের সবুজ পাতা প্রায় দেখাই যায় না দূর থেকে।

বাসের মধ্যে সবাই চুপচাপ, শুধু সামনের দিকে বসা তিনটি ব্যক্তি ছাড়া—তার মধ্যে দুজন স্বামী-স্ত্রী, অন্যজন স্বামীর বন্ধু। অত্যাধুনিক ফ্যাশানের পোশাক তাঁদের পরণে, উচ্চকণ্ঠে অবিরাম কথা বলে চলেছেন—এ ব্যাপারে তিনজনের মধ্যে যেন একটা অঘোষিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেধে গেছে। কথা বলায় এবং নিজেকে জাহির করায় নারীর উৎসাহটাই যেন সমধিক—বাবু যত বলে বিবিজান তার বলে ওঠে শতগুণ। তাঁদের চীৎকার আর হা হা হাসিতে অন্যের শান্তি যে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে সে বিষয়ে তাঁদের বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁদের হুঁশই নেই যে তাঁদের উচ্চ চেঁচামেচিতে হিমালয়ের পবিত্র গম্ভীর প্রশান্তি ছিঁড়েখুঁড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তাঁরা

কোথায় আছেন, কোথায় চলেছেন, কেন এসেছেন, কাদের সঙ্গে আছেন সবকিছুই বিলকুল ভুলে গেছেন মনে হয়!

বাস উঠে এসেছে অনেক উঁচুতে, কিন্তু এখানেও দেখছি দু-একটা গোরু চরছে। আশ্চর্য বোধ হলো, এখানেও কি মানুষের বসতি আছে নাকি! বুঝতেই পারিনি হিমালয়ের এতো ওপরে, তার এই গহন প্রচ্ছন্ন প্রদেশেও এতো মানুষ বসবাস করে। হঠাৎ দেখলাম একটা লোকালয়ে এসে পড়েছি। নাম তার নরেন্দ্রনগর—সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১১৯০ মিটার অর্থাৎ ৩৮০৩ ফুট উঁচুতে। আরও উঁচুতে বাস উঠতে লাগলো।

এক জায়গায় দেখি অনেকটা জায়গা জুড়ে বিরাট গভীর এক খাদ সমুদ্রের মতো নীল হয়ে আছে—মনে হলো যেন নীল রঙের কুয়াশায় সাবা খাদটা ভরে গেছে, তার ভেতর দিয়ে আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে অসংখ্য পাহাড়ের চূড়া। কে যেন এক ইন্দ্রজাল বিছিয়ে রেখেছে সমস্ত অঞ্চলটা জুড়ে!

পাহাড়ের ধাপে ধাপে বাড়ী। গোরু ছাগল, দোকান পসার সবই আছে। পাহাড়ের গা কেটে কেটে টুকরো টুকরো জমি তৈরী হয়েছে। এইসব জমিতে এখন গম আর আলুর চাষ চলছে। অবাক কাণ্ড—এইসব ফালি ফালি জমিতে মাটির চাইতে নুড়ি পাথরই বেশী, অথচ ঝর্ণার জল আর বর্ষাকালে বর্ষার জল জমিয়ে সেই নুড়িবহুল জমিতেই ফসল ফলায় পাহাড়ী মানুষেরা।

যতক্ষণ ধরে এলাম সর্বত্রই দেখলাম পাহাড় কেটে কেটে জমি বানানো হয়েছে ঝুম চাষের জন্য—পাহাড়ের গায়ে জমিগুলিকে সিঁড়ির মতো মনে হয়। জল জমিয়ে রাখার জন্য বড় বড় পাথর সাজিয়ে প্রতিটি ফালি জমির চারিদিকে পাঁচিল তৈরী করা হয়েছে। দূর থেকে বেশ লাগছে দেখতে—কোন ফালিতে পাকা গমের সোনা রঙ, কোনটা বা সব্‌জিতে সবুজ। কোন কোন জমিতে বীজ বোনা হয়েছে আলপনার ঢঙে, এখন হলুদ হলুদ অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে, দেখতে ভারি সুন্দর লাগছে। কৃষিকর্মে পাহাড়ীদের শিল্পবোধের প্রতিফলন সত্যিই দেখবার মতো। কোন কোন জায়গায়

জমিতে জল জমিয়ে রাখা হয়েছে, এখনো বীজ লাগানো হয়নি। কোন জমিতে বলদ দিয়ে লাঙল দেবার আয়োজন চলছে। কোন ক্ষেতে বা ফসল কাটার ধুম লেগে গেছে। ক্ষেত খামারের কাজ করছে বেশীর ভাগই মেয়েরা। এদেশের শিশুরা আর মেয়েরা দেখতে ভারি সুন্দর—যেমন চোখমুখের গড়ন, তেমনি গোলাপের মতো গায়ের রঙ, আর তেমনি রঙচঙে ঝলমলে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ, জরির কাজ করা, নানা রকম ডিজাইনে বোনা।

গ্রামের পর গ্রাম ছাড়িয়ে চলেছি। নরেন্দ্রনগরের পর কোলাখাল (এখানে একটি দেবীমন্দির আছে), আগ্রাখাল, জাজল, খাড়ি, নাগ্‌নী ছাড়িয়ে এসে পড়লাম চৌপড়িয়ালী গ্রামে। সুন্দর সুন্দর মেয়েরা চাষের কাজ ফেলে বাস যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে রইলো। একটু পরেই একপাল শিশু এসে ঘিরে দাঁড়ালো বাসটাকে। তারপর বাস চললো এগিয়ে - উৎরাই ভাঙতে ভাঙতে। পড়ে রইল সাব্‌লী, চম্বা আর বাগবাটা। বাগবাটায় প্রায় দেড়শো দু'শো মোষ দেখলাম। দুধ শুধু এদের খাদ্য নয়, পণ্যও।

বেলা দশটায় নেমে এলাম টেহ্‌রি-গাড়োয়ালের প্রধান শহর টেহ্‌রিতে (তিহরি), সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬৪০ মিটার অর্থাৎ ২০৯৯ ফুট উঁচুতে। এই সেই টেহ্‌রি, একদা স্বাধীন গাড়োয়ালের রাজধানী, যার কথা কৈশোরে জলধর সেনের "প্রবাস চিত্র" গ্রন্থে পড়েছিলাম, আর যার স্বপ্নচিত্রটি অতি সযতনে এঁকে রেখেছিলাম মনের গোপন পাতায়।

ইংরেজ আমলে টেহ্‌রি গাড়োয়াল ছিল একটি করদ রাজ্য, টেহ্‌রির মহারাজার হুকুম না নিয়ে কেউ তখন ঢুকতে পারতো না গাড়োয়ালের ত্রিসীমানায়। আজ মহারাজা নেই, টেহ্‌রি এখন টেহ্‌রি গাড়োয়াল জেলার প্রধান শহর মাত্র। গাড়োয়ালকে এখন টেহ্‌রি, উত্তরকাশী, চামোলি আর পউরি এই চারটি জেলায় ভাগ করা হয়েছে। মহারাজার বাড়ি পাহাড়ের মাথায়। তাঁর বংশের কেউ থাকেন না টেহ্‌রিতে, তাঁরা এখন দিল্লীবাসী। ডিংনালা (অন্য নাম ভিলং) আর গঙ্গা এই দুটি নদী

বয়ে গেছে টেহ্‌রির ছ'পাশ দিয়ে হাত ধরাধরি করে। প্রবহমান সময়ের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কতো রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে গেল। গাড়োয়ালের অমিত পরাক্রমশালী মহারাজা তাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপ, চোখ-ধাঁধানো জাঁকজমক, হাতি ঘোড়া সৈন্যসামন্ত লোকলস্কর নিয়ে স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেলেন, তাঁর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা সিংহবিক্রম যে বৃটিশ সম্রাট তিনিও বুদ্‌বুদের মতো নিমেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেন, কিন্তু গঙ্গা আর ডিংনালা সেদিনকার মতো আজও আপন মনে খেলা করে চলেছেন টেহ্‌রিকে বেষ্টন করে, মানুষের উত্থান পতনে তাঁদের মনে এতটুকুও বিক্ষেপ ঘটেনি।

এককালে বিশাল গাড়োয়াল রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন গাড়োয়ালের মহারাজা। তাঁর রাজধানী ছিল শ্রীনগরে। কিন্তু কোন এক সময়ে প্রতিবেশী নেপালরাজের অত্যাচারে ভীত হয়ে গাড়োয়ালরাজ টেহ্‌রিতে পালিয়ে এসে বসবাস করতে শুরু করেন। নেপালরাজ গাড়োয়ালের অনেকটা অংশ আত্মসাৎ করে নেন। রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য গাড়োয়ালের রাজা ইংরেজের দ্বারস্থ হলে ইংরেজ সরকার তাঁর হৃত রাজ্য উদ্ধার করে দেন বটে, কিন্তু যুদ্ধে তাঁদের ক্ষয়ক্ষতির ক্ষতিপূরণ স্বরূপ গাড়োয়ালের একটা অংশ নিজেদের অধিকারেই রেখে দেন। তখন থেকে ভাবত স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত গাড়োয়াল ছুভাগে বিভক্ত ছিল—বৃটিশ গাড়োয়াল আর স্বাধীন গাড়োয়াল। প্রথমটির রাজধানী ছিল শ্রীনগরে, আব দ্বিতীয়টির টেহ্‌রিতে।

টেহ্‌রি ছাড়িয়ে যাত্রা করলাম প্রায় এগারোটার সময়। গ্রামগুলি ছবির মতো। পাহাড়ের ধাপে ধাপে বাড়ি, পাথর বা ইঁটের—সিমেণ্ট অথবা মাটি দিয়ে গাঁথা, পাতলা পাথরের আঁশ দিয়ে ছাওয়া যেরকম পাথরের অজস্র পাহাড় দেখে এলাম পথের ছুপাশে আসবার সময়। মাঝে মাঝে কাঠের বাড়ি, অথবা কাঠ দিয়ে ছাওয়া বাড়িও দেখা গেল। খড়ে ছাওয়া মাটির বাড়ি কদাচিৎ চোখে পড়ে। অনেক সময় বাস-রাস্তার অনেক উঁচুতে সারি সারি বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। মেয়েরা বাড়ির বারান্দায় বসে কাজ করছে, মুখ তুলে চাইছে বাসের দিকে—ভ্রূক্ষেপ নেই, চাঞ্চল্য

নেই, ধ্যানমগ্ন শান্ত ছবির মতো। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বাড়ির উঠোনে বসে রোদ পোহাচ্ছে। তাদের পাশে বাড়ির পোষা ছাগল আর ভেড়াগুলি দাঁড়িয়ে বা শুয়ে আছে।

অনেক সময় ঝর্ণার ধারেই বাড়ি তৈরী হয়েছে, কখনো কখনো বাড়ির তলা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ঝর্ণার জল। আবার কোথাও বা দেখতে পাচ্ছি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দ্রুতগতিতে নেমে আসছে পাহাড়ের গা বেয়ে বড় বড় পাত্র ভরে অনেক নীচের ঝর্ণা থেকে জল নিতে। গ্রামের বাড়িগুলি ধাপে ধাপে উঠে গেছে—চারপাশে বড় বড় পাথর, ফাঁকে ফাঁকে গাছপালা, পাহাড়ের মাথায় চীর গাছের বন, কখনো বা চোখে পড়ছে লোমওয়ালা ছাগল অথবা ভেড়ার পাল, কিংবা গুল্মাচ্ছন্ন সবুজ ক্ষেত্রে চারণরত গোরু আর মোষের দল। মাঝে মাঝে মেয়েরা চলেছে মাথায় স্তূপীকৃত সবুজ পাতার বোঝা নিয়ে। এখানে ওখানে গাছের গুঁড়িতে গমের খড় আঁটি করে ঝুলোনো।

ছাম ধরাস্থু ডুণ্ডা আর মাত্‌লী গ্রাম ছাড়িয়ে দু'টো কুড়ি মিনিটে এসে পড়লাম উত্তরকাশীতে। উত্তরকাশী গঙ্গাতীরে অবস্থিত পুরাতন অথচ আধুনিক শহর। এখানে যাত্রী নামলো যত উঠলো তার চতুর্গুণ। ঠাসাঠাসি ঠেলাঠেলির জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলাম। আমার পাশে এসে বসলো লোটাকম্বলসম্বল গেরুয়াধারী এক সাধু। অন্য এক সাধু দাঁড়ালো এসে তার পাশে। এক বৃদ্ধ রাজস্থানী বিরাট এক গাঁটরি পিঠে করে দাঁড়ালো তাদের কাছে। পেছনের পুরো সিটটাই দখল করে নিলে এক গাড়োয়ালী পরিবার—শিশু নারী আর দু-তিন জনা পুরুষ নিয়ে তাদের সংখ্যা হবে প্রায় দশ। বাস ছাড়বার পর ওদের সকলের সঙ্গে আলাপ জমে উঠলো। আমার পাশে বসা সাধুটির নাম পৃথিবী গিরি। বছর কুড়ি আগে কলকাতায় বণ্ডেল গেট অঞ্চলে থাকতো সে। কাজ করতো এক পেতলের কারখানায়। সন্তান সন্ততি ছিল না তার। স্ত্রীবিয়োগের পর মনে বৈরাগ্যের উদয় হলো, তাই বেরিয়ে পড়লো সংসার ছেড়ে। পাশে দাঁড়ানো সাধুটি তার গুরু—নাম মোহান্তদেব গিরি, রাজস্থানী ভদ্রলোকটি

তার গুরুভাই। তারাও চলেছে গঙ্গোত্রী গোমুখের পথে। প্রশ্ন করলাম কী মিললো সংসার ছেড়ে এসে? সাধুটি বিনয়ী নম্র মিষ্টভাষী। বললে— পরমাত্মা লাভ করা তো সহজ কথা নয়, তবে বুকের জ্বালা, যা নিয়ে ঘর ছেড়েছিলাম, সেটা জুড়িয়েছে।

গুরু পাশে দাঁড়িয়ে, অথচ সেজন্য বিন্দুমাত্রও সংকোচ নেই শিষ্যের মনে, সে দিব্যি আরাম করে নিজের বসার ব্যবস্থাটি করে নিয়েছে। তার জন্য গুরুরও কোন ক্ষোভ নেই। কেমন সহজ সম্বন্ধটি গুরু আর শিষ্যের মধ্যে। গুরুমহারাজের হাত ধরে যে রাজাধিরাজের রাজ্যের উদ্দেশে যাত্রা করেছে শিষ্য সেই রাজ্যের সীমানায় পৌঁছে গেলে গুরু শিষ্যের ভেদাভেদ বুঝি আর থাকে না, তখন "আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।"

গাড়োয়ালী পরিবারের গৃহকর্তা সাণ্ডুপ সিং দলেই আছে। এক সময় কলকাতায় থাকতো, শিলিগুড়িতেও। বছর বারো হলো দেশে চলে এসেছে। গাংনানী থেকে কাল যাবে ধাবরানী, সেখান থেকে বাসে চড়ে তার গ্রামের বাড়ি হর্সিলে। ডুণ্ডাতেও তার বাড়ি আছে। গ্রীষ্মকালে থাকে হর্সিলের বাড়িতে, আর শীতকালে ডুণ্ডায়। মুসৌরীতেও বাসা করেছে। সেখানে ব্যবসা করে পশমের। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখছে মুসৌরীতে। গাংনানীতে খচ্চরের ব্যবসা আছে। যাত্রীদের মালপত্র নিয়ে যাবার জন্য খচ্চর ভাড়া দেয় সাণ্ডুপ সিং। দলের ছেলেমেয়ে বৌ সকলেরই পোশাকে আসাকে চলনে বলনে আভিজাত্যের ছাপ।

উত্তরকাশীতে বেশ ঠাণ্ডা বোধ হলো। একটি বাড়িতে দেখলাম টবে গাঁদাফুল ফুটে রয়েছে দোতলার বারান্দায়। বাস যত ওপরে উঠতে লাগলো ঠাণ্ডাও তত বাড়তে লাগলো। বাসে এক দম্পতির সঙ্গেও আলাপ হলো। জয়পুরের অধিবাসী এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আর তাঁর স্ত্রী। ভদ্রলোকের নাম হরদয়াল শর্মা। যমুনোত্রীর টিকিট চেয়েছিলেন, দিয়েছে গঙ্গোত্রীর। আক্ষেপ নেই, বললেন—কী আর করি, গঙ্গা মাঈর মর্জি। আমরা গোমুখ যাচ্ছি শুনে বললেন—কে জানে, মাঈর মর্জি হয় তো গোমুখও যেতে পারি। ভদ্রলোকের মুখে চোখে একটি শান্ত সমাহিত ভাব, তবে একটু

বেশী কথা বলেন। ওঁর স্ত্রী কিন্তু নিতান্তই লজ্জাশীলা এবং স্বল্পবাক, প্রায় নির্বাকও বলা চলে। যেখানে দুজনেই মুখর সেখানে গান জমে না। গান তখনই জমবে যখন "গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেকজন গাবে মনে"। দুজনেই চঞ্চল হলে সংগীতের সৃষ্টি সম্ভব নয়। একের স্থৈর্য আর অন্যের চাঞ্চল্য এ না হলে যুগ্ম সংগীত রচিত হবে কেমন করে?— "তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ তবে সে কলতান উঠে"। দাম্পত্য সম্পর্কটি সার্থক হতে হলে স্বামী-স্ত্রীর স্বভাব হবে পরস্পরের সম্পূরক। তাই শর্মাজীর দাম্পত্য জীবনটিকে সুখের বলেই মনে হলো।

গংগোরী আর হিনা গ্রাম অতিক্রম করে এসে পড়লাম এক অদ্ভুত জায়গায় দুপাশে পাহাড়—মাঝে শুকনো নদীখতে বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই, তাদের গা থেকে রূপোলী আলো ঠিকরে পড়ছে—সেই সব পাথরের বুকে পথ কেটে বয়ে চলেছে ঝর্ণার উদ্দাম স্রোতধারা। পাহাড়ের গা ঘেঁষে ঝর্ণার জলে পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় প্রঞ্চাশটা নধর মোষ, তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের বাসটার দিকে। পাহাড়ের গা বেয়ে আকাশে উঠে গেছে লম্বা লম্বা গাছ। যেন অকস্মাৎ একটা অপ্রত্যাশিত অকল্পিত মহান ছবি আপনা থেকে চোখের সামনে আবির্ভূত হয়ে হঠাৎই হারিয়ে গেল—ক্যামেরায় তাকে বেঁধে রাখবার মতো সুযোগটুকুও মিললো না।

এমনি করে আচমকা কতবার অনন্তের মধুর ছোঁয়া লাগে আমাদের মনে, নিতান্তই তুচ্ছ কোন বস্তু বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রাণে আমাদের জেগে ওঠে রোমাঞ্চ, কিন্তু ভালো করে সেটি বুঝতে না বুঝতেই, ভোগ করতে না করতেই তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগ-সূত্রটি যায় ছিঁড়ে। পেয়েও তাকে পাই না। ধরা দিয়েও তিনি বাঁধা পড়েন না আমাদের কাছে। কখন আসবেন তিনি আমাদের জীবনে কেউ তা জানি না। তাই প্রস্তুত থাকতে পারি না তাঁকে শক্ত করে ধরে রাখবার জন্য। আর আমাদের এই অসতর্কতার সুযোগ নিয়েই তিনি হঠাৎ এসে হঠাৎই পালিয়ে যান আমাদের অনুভূতির রাজ্য থেকে।

এসে পড়লাম মনেরী গ্রামে। এখানে গঙ্গায় বাঁধ বেঁধে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে! মনেরীতে ঢুকেই গাড়ির একটা টায়ার বিরাট শব্দ করে ফেটে গেল। সুতরাং মেরামতির জন্য এখানে প্রতীক্ষা করতে হলো অনেকক্ষণ।

চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখলাম। পাহাড়ে ঘেরা শান্ত গ্রাম মনেরী—এখানে ঝর্ণা, ওখানে ঝর্ণা, চায়ের দোকানের পাশে মাটি ফুঁড়ে এক গুচ্ছ বেগনী রঙের ফুল ফুটে আছে—কী সুন্দর দেখতে! পাতা নেই, মৃদু বাতাসে তির্‌তির্‌ করে কাঁপছে। জিগ্যেস করে জানলাম এগুলি গুলতস্‌বির ফুল। গঙ্গা বয়ে চলেছেন একপাশ দিয়ে। দুটো পাহাড়ের ওপাশ থেকে উঁকি মারছে আর একটা পাহাড়। গঙ্গার ওপর বাঁধা হয়েছে ছোট্ট একটি হাল্‌কা ধরনের সাঁকো। পাহাড়ের গা ছেয়ে লম্বা লম্বা চীর আর সান্তারা (কমলালেবু) গাছ আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

যখন গাড়ি ছাড়লো তখন টিপ্‌ টিপ্‌ করে বৃষ্টি পড়ছে। ক্রমে ক্রমে বৃষ্টির জোর বাড়তে লাগলো। ঠাণ্ডা বাতাস লেগে একটা কনকনানির আমেজ ছড়ালো সারা অঙ্গে। সবাই বাসের জানালা দুমদাম করে বন্ধ করে দিলে। জয়পুরের ভদ্রলোক তাঁদের দেশের দুই সাধুমোহান্তের গল্প বলছিলেন যাঁদের সিদ্ধাই এরকম যে, দিনেরাতে যে কোন সময়ে যে কোন লোক তাঁদের কাছে গিয়ে পড়লে তাঁরা তক্ষুনি অতিথিদের মনের মতো খাবার পরিবেশন করতে পারেন। জানালার ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম স্থানীয় পথচারীরা বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার জন্য পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে আশ্রয় নিয়েছে। এক জায়গায় একরাশ মেয়ে বিরাট বিরাট ঝুড়ির মধ্যে ঢুকে বসেছে পাহাড়ের আড়ালে—আমাদের দেখে খিল খিল করে সে কী হাসি বাহার। হাসতে হাসতে একে অন্যের গায়ে গড়িয়ে পড়ছে।

মনেরী ছাড়িয়ে বাস এসে পড়লো ভট্‌ওয়ারীতে—এখানে সেই দুই সাধ্‌ আর রাজস্থানী বুড়ো ভদ্রলোক নেমে গেলেন। ভট্‌ওয়ারীর পর বুক্‌কি। বুক্‌কির পর গাংনানীতে ঢুকবার মুখে সে আর এক আশ্চর্য ছবি।

গাংনানীর ঝর্ণা! তিন চার ধারায় স্তরে স্তরে ছন্দে ছন্দে নাচতে নাচতে হেলতে দুলতে বিগলিত রৌপ্য ধারা নেমে আসছে রূপের আলো ছড়াতে ছড়াতে। কী সেই রূপ, কী সে প্রাণ, কী তার আনন্দ! আরে আরে আরও যে ঝর্ণা, আরও আরো, এ যেন ঝর্ণার রাজ্যে এসে পড়েছি, প্রত্যেকটাই যেন প্রত্যেকটার চাইতে সুন্দর—এ যেন ধরণীর ধূলায় ঝর্ণাপরীদের রূপের হাট বসে গেছে —এ বলছে দেখ আমি কতো সুন্দর, ও বলছে দেখ দেখ আমি আরো কতো সুন্দর।

গাংনানী পোঁছোলুম সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গাংনানীর উচ্চতা ১৯৮২ মিটার, অর্থাৎ প্রায় ৬৬০০ ফুট। লিখছি তাঁবুতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে, মোমবাতি জ্বেলে। ওপরে অনন্ত আকাশ। হাত পনেরো কুড়ি দূরেই প্রবল তরঙ্গসঙ্কুল গঙ্গা, তার গুরু গুরু গম্ভীর গর্জন অবিরাম কানে বাজছে। তাঁবুর যে পাশটায় শুয়ে আছি সেখানে মাত্র একটা জলজ্বলে চট টাঙানো। হি হি করে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছে তাঁবুর ভেতর। লেপ তোশক ভাড়া নিয়েছি। পুলোভার র‍্যাপার গায়ে চড়িয়েছি। আলসেমী করে সঙ্গে আনা কম্বলগুলো আর বের করিনি। গৌরবাবু, ডঃ কর্মকার আর গোবিন্দবাবু পরম সুখে নিদ্রার উষ্ণ আলিঙ্গনে নিজেদের সঁপে দিয়েছেন। জয়পুরের সেই দম্পতিও আমাদের তাঁবুতেই ঠাঁই নিয়েছেন। ভদ্রলোক কিছুতেই তাঁর বাড়ি থেকে আনা পুরি চানা আর আচার না খাইয়ে ছাড়লেন না। তাঁরাও ঘুমিয়ে পড়েছেন। আরও অনেক যাত্রী যাত্রিনী এসে ঢুকেছেন আমাদের তাঁবুতে। কয়েকজন বৃদ্ধা ছাড়া আর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। বুড়িদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি।

আজকের মতো এখানেই থামলাম···মোমবাতির অর্ধেকটার বেশী পুড়ে গেছে। রাতের খাবার ঘণ্টা তিনেক আগে শেষ করেছি চাপাটি ডাল আর আলুর ঝোল দিয়ে। কাল সকালে উঠে গঙ্গোত্রীর পথে যাত্রা শুরু করার কথা। এসেই শুনলাম এখান থেকে এক কিলোমিটার দূরে সুন্দর একটা উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। ইচ্ছে ছিল গিয়ে দেখে আসি। বেরিয়েছি তো দেখবার জন্যই, যেখানে যা পাবো তাই দেখে নেব দু'চোখ মেলে, প্রাণ

মন ভরে। কিন্তু সঙ্গীরা যেতে নারাজ—তাঁরা নাকি ভীষণ ক্লান্ত। বলতে ইচ্ছে করছিল—ক্লান্তি আমার ক্ষমা ক'রো, ক্ষমা করো প্রভু।

ঘুম যখন ভাঙলো তখন সকাল ছ'টা। ডঃ কর্মকার, ডঃ চৌধুরী, গোবিন্দবাবু ইতিপূর্বেই উঠে পড়েছেন—গঙ্গোত্রী যাত্রার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। জয়পুরের হরদয়াল শর্মা তাঁর অধাঙ্গিনীকে নিয়ে এরই মধ্যে রওনা হয়ে গেছেন। কাল অনেক রাত্তিরে এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রী আর বৃদ্ধা মাকে নিয়ে তাঁবুতে আমাদেরই পাশে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কাল তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় নি। আমি তখন লেখায় ব্যস্ত। উনি গভীরভাবে আমাকে লক্ষ্য করছিলেন। আজ সকালে উঠেই দেখি তিনি পাশে বসে। সুপ্রভাত জানিয়ে পরিচয় জানতে চাইলাম। চণ্ডীগড় থেকে আসছেন। নাম রাজকুমার গর্গ। কী কাজ করেন জানতে চাইলে বললেন একটা ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার, অবশ্য ফ্যাক্টরীর মালিক তাঁরই এক ছেলে, সে ইঞ্জিনীয়ার। আর দুই ছেলের একজন ডাক্তার, অন্য জন আর্কিটেক্ট। এক মেয়ে, তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। বছর কয়েক আগে স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিলেন অমরনাথ, সেই দুর্গম পথে মাকে নিয়ে যেতে পারেন নি। তখনই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন মায়ের কাছে—তাঁকে চার ধাম (কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী) দেখিয়ে আনবেন। সেদিনকার সেই প্রতিশ্রুতি পালন করতেই এবারের এই অভিযান।

আমাদের আগে একে একে আর সকলেই রওয়ানা হয়ে গেলেন, তাঁবু খালি হয়ে গেল। আমরা যখন যাত্রা শুরু করলাম তখন আটটা বেজে গেছে। আমরা একটা খচ্চর ভাড়া করেছি—তারই পিঠে আমাদের জিনিসপত্তর যাবে। খচ্চরের খবরদারি করবে যে, সে আরও একটা খচ্চরের পিঠে অন্য আর একজনের সামান চাপিয়েছে, অর্থাৎ তার জিম্মায়

দুই খচ্চর। অনেকেই গাংনানীর তাঁবুতে তাদের বেশীর ভাগ বোঝা রেখে গেল। আমরা কিন্তু আমাদের যা-কিছু সবই নিয়ে চললাম সঙ্গে করে। কী আর রেখে যাবো, সবই তো কাজে লাগতে পারে। আমার ধারণা ছিল খচ্চরের আগেই আমরা পৌঁছে যাবো ধাবরাণী, যেখান থেকে বাস ধরতে হবে। কিন্তু দেখতে না দেখতেই খচ্চর ঝড়ের বেগে এগিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। সারা পথে তার দেখা আর পাই নি। আট ঘণ্টা পথ চলে যখন ধাবরাণী পৌঁছোলাম তখন দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আমাদের দেখতে পেয়ে ছুটে এলো খচ্চরওয়ালা। ও হয়তো ভেবেছিল পথেই আমাদের যাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটে গেছে। শুনলাম বারোটা সাড়ে বারোটার মধ্যেই তারা ধাবরানী পৌঁছে গেছে।

গাংনানী থেকে বেরিয়েই যে ক্রমান্বয়ে এতো ভয়ংকর চড়াই ভাঙতে হবে কে তা জানতো। মিনিট দশ পনেরো যাবার পরই খচ্চরওয়ালাকে বহু দূরে দেখতে পেয়েছিলাম—তাকে চেঁচিয়ে ডাকলাম, থামতে বললাম, যে চারটে ছোটখাটো বোঝা সঙ্গে নিয়ে চলেছি পনেরো মিনিট চলার পরই বুঝতে পারছি সেগুলো খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে দিলেই ভালো হতো, হাল্কা হয়ে হাঁটতে পারতাম। কিন্তু খচ্চরওয়ালা আমাদের ডাক শুনতেই পেলো না। ফলে সমস্ত পথটাই পাড়ি দিতে হলো দুই কাঁধে দু'দুটো বোঝা ঝুলিয়ে। হাতে লাঠি ছিল তাই রক্ষে। লাঠি ছাড়া এ পথে এক ইঞ্চিও চলবার উপায় নেই - ভারসাম্য রাখবার একমাত্র যন্ত্রই হলো লাঠি।

মাঝখানে একবার পথ হারিয়ে ফেলেছিলুম। স্থানীয় লোকজনদের জিগ্যেস করে শুরুতেই ভুল শুধরে নেওয়া গেল।

ক্রমান্বয়ে ওপরে উঠছি লাঠির ওপর ভর দিয়ে। একপাশে ন'শো/হাজার ফুট গভীর খাদে গঙ্গা বয়ে চলেছেন, অন্য পাশে কয়েক হাজার ফুট উঁচু পাহাড়। পথ এঁকে বেঁকে ওপরে উঠে গেছে। পথের প্রস্থ তিন থেকে পাঁচ হাতের মতো। পাহাড়ের ওপর লম্বা লম্বা গাছ আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে। কত রকমের কত রঙের ফুল যে ফুটে আছে! একটা গাছে টকটকে লাল সুন্দর গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের দেখা পেলাম; কী সুন্দর সৃষ্টি!

আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে শ' পাঁচেক লোমওয়ালা ভেড়ার পাল নিয়ে দুজন মেষপালক। সঙ্গে দুই লোমশ কালো কুকুর—ভেড়াগুলোকে পাহারা দেবার এবং তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার ভার এদের ওপর। ভেড়ার পাল পাহাড়ের ওপর দিয়ে চলেছে ঘাসপাতা চিবোতে চিবোতে। আমি এগিয়ে আছি। আমার ঠিক পেছনে পেছনে আসছে একজন মেষপালক।

হঠাৎ একসময় সে চেঁচিয়ে উঠলো—মহারাজ, সাবধান হো যা, পাহাড়সে ভেড়িয়াঁ পত্থর নিকলে। বলতে না বলতেই দু'টো বলের মতো পাথরের চাঁই সাঁ করে আমার কান ঘেঁষে ছুটে বেরিয়ে গেল। গৌরবাবু বলে উঠলেন—এক্ষুনি আপনার মাথাটাই উড়ে যাচ্ছিল আর কী। বললাম—ঘাব্‌ড়াইয়ে মত্‌। এর আগে বিশ্বজননী তিন তিনবার আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন, আমার আবার ভয় কী? আর যদি মৃত্যু ঘটেই তাহলেও তাঁরই ইচ্ছেতেই ঘটবে। সুতরাং মা ভৈঃ।

আবার সেই লাল ফুল পড়লো চোখে। গাছটার নাম জানতে চাইলাম ভেড়াওয়ালার কাছে। সে বললে—আমরা এ গাছকে বলি আইয়ার। বুরাঁশ গাছও সে চিনিয়ে দিলে। শুনেছি বুরাঁশ নাকি রডোডেনড্রনের স্থানীয় নাম। হঠাৎ বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখি বিরাট এক পর্বত—নীল কলেবর, মাথায় বরফের মুকুট। বরফের ওপর সূর্যের আলো পড়ে ঝলমল করছে। এতক্ষনে মনে হলো সত্যিকারের হিমালয়ের দেখা পেলাম। এর আগে এত পাহাড় দেখলাম, কিন্তু কারো মাথায় বরফ দেখিনি। হিমালয়ে যদি হিমই না থাকলো তাহলে হিমালয় নামের সার্থকতা কোথায়? প্রশ্ন শুনে ডঃ চৌধুরী সুন্দর একটা উত্তর দিলেন। বললেন—আপনার আলয়ের সব জায়গাতে বা আপনার যত আলয় আছে তার সবগুলোতেই কি আপনি সব সময় থাকেন নাকি? হিমালয়ের বেলায়ও ঠিক তাই।

ক্রমশঃ চড়াই উঠে গেছে—পথ সমান বিপদসংকুল ভেড়ার দল সঙ্গে

সঙ্গে চলেছে—তাদের পায়ের ঠোক্করে নুড়ি পাথর প্রায়ই ছিটকে পড়ছে নীচে। সাবধানে পথ চলতে হচ্ছে। কখনো কখনো তারা পাহাড়ের গা বেয়ে পথের ওপর নেমে আসছে—কখনো তারা সামনে আমরা পিছিয়ে. কখনো আমরা এগিয়ে তারা পেছনে।

আধঘণ্টা চড়াই ভাঙবার পর পথের বাঁক নিয়েই দেখি কী সুন্দর একটি জায়গা—একপাশে পাহাড়ের কোলে দু'তিন খানা চা-খাবারের দোকান লম্বা লম্বা গাছের ঘন ছায়ার মধ্যে। অন্যদিকে গভীর খাদ দিয়ে গঙ্গা বয়ে চলেছেন। খাদের ওপারে পাহাড়ের পর পাহাড়। সামনের পাহাড়ের পেছন থেকে উঁকি মারছে আর এক পাহাড়—তারও পেছনে আরও আরও আরও পাহাড় দেখতে পাচ্ছি। হৃষীকেশ ছাড়বার পর থেকে যে মুহূর্তে হিমালয়ের ভেতর ঢুকে পড়েছি তখন থেকেই যে দিকে তাকাই দেখতে পাচ্ছি যত দূর দৃষ্টি যায় তত দূর জুড়ে শুধু পাহাড় থৈ থৈ করছে—কোনোটা একটু ছোট, কোনোটা একটু বড়, কারো রঙ ধূসর, কেউ বা নীল। যে জায়গায় এসে পড়েছি তার নাম জঙ্গলচট্টি। একটা দোকানে কাঁচা কাঠের তক্তার ওপর বসে চায়ে চুমুক দিলাম। চা তৈরী হবার আগে সঙ্গে আনা মায়ের তৈরী চিঁড়ে ভাজা, ডঃ কর্মকারের বাড়ির তৈরী মুড়কি খাওয়া হয়ে গেছে। দোকানীর কাছ থেকে চেয়ে খেয়েছি ঝর্ণার জল—কী মিষ্টি! দোকানের পেছনে পাহাড়ের গায়ে আঁকা হয়ে আছে চার গাছের বন, বনের তলায় সবুজ সব্জির ক্ষেত স্তরে স্তরে নেমে এসেছে।

মিনিট কুড়ি বিশ্রাম নিয়ে আবার শুরু করলাম চলা। যতই উঠছি ওঠার যেন আর বিরাম নেই। লাঠি মুঠো করে হাত ব্যথা করতে আরম্ভ করেছে। হাত-পা ছিঁড়ে পড়ার উপক্রম—অথচ অনেক অনেক পথ এখনো চলতে হবে, ক্রমশ দুর্গমতর হবে সেই পথ। মন তৈরী, শরীরও মনের সুরে সাধা হয়ে গেছে। অবশ্য আমরা, বিশেষ করে ডঃ কর্মকার, ধীর গতিতে চলেছি। তাঁর সঙ্গে তাল রাখতে আমাদেরও গতি শ্লথ করতে হচ্ছে—কখনো কখনো আমরা চলেছি প্রকৃতই শম্বুক গতিতে। আমি মাঝে মাঝে

এগিয়ে পড়ছি। খানিকটা গিয়ে অপেক্ষা করছি সঙ্গীদের জন্য। পেছনে যারা আসছিল তাদের অনেকেই আমাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। তাতে কী? আমরা চলেছি আমাদের আপন ছন্দে! চারজন কাণ্ডিওয়ালা আমাদের বয়ে নিতে চাইছিলো। পথেই দেখা ওদের সঙ্গে। আমরা না করলুম—কারণ এ চলার মধ্যে যন্ত্রণা আছে অশেষ, কিন্তু এমন একটা উত্তেজনামেশা আনন্দের নেশা ধরে গেছে যে এ চলায় জলাঞ্জলি দিয়ে মানুষের পিঠে কিছুতেই উঠে বসতে মন সরলো না।

মাঝে মাঝে গঙ্গোত্রী গোমুখ থেকে ফিরতি পথের যাত্রীদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। দেখা হলে সবাই বলছেন—জয় গঙ্গা মাঈয়া কী জয়, জয় গঙ্গা দেবী কী জয়। আমরাও একই কথা বলে সম্বর্ধনা জানাচ্ছি তাঁদের। তাঁদের মধ্যে আছেন স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা যুবক-যুবতী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সব রকমের যাত্রী—কেউ চলেছেন একা, কেউ বা দলের সঙ্গে, কেউ কাণ্ডিতে, কেউ ডাণ্ডি চড়ে, কেউ বা খচ্চরের অথবা ঘোড়ার পিঠে, অধিকাংশই পদব্রজে।

যাত্রীদের মধ্যে—যাঁরা পেছন থেকে আমাদের ছাড়িয়ে যাচ্ছেন আর যাঁরা আমাদের পাশ কাটিয়ে আমাদের ফেলে আসা পথের দিকে এগিয়ে চলেছেন তাঁদের সকলের ভেতর বেশ কিছু সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীরও দেখা পেলাম। পদচারী সকলেরই হাতে লাঠি, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, কাঁধে অথবা পিঠে ঝোলা। কয়েকজন শেঠজী ডাণ্ডি হাঁকিয়ে চলে গেলেন। একজন কিশোর, বিরাট তার বপু, সেও চলে গেল ডাণ্ডি করে চার জোয়ানের ঘাড়ে চড়ে। কাণ্ডি চড়ে গেলেন বেশ কিছু বৃদ্ধ বৃদ্ধা, দুটি ছোট্ট ভাইবোনও। একজন যুবতী চলেছেন বাবা আর ভায়ের সঙ্গে—পথ দুর্গমতর হলে তিনি উঠে বসছেন ঘোড়ার পিঠে।

চারজনের আর একটি দলও চলেছে। আধুনিকতার উগ্র গন্ধ তাদের গায়ে। দলপতি চলেছেন দামী স্যুট পরে, দামী টাই হাঁকিয়ে। মুখে চুরুট। হাই পাওয়ারের চশমার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে তীক্ষ্ণ দুটি চোখ। মাথায় একরাশ কাঁচাপাকা উদ্ভ্রান্ত চুল, চুলের ডগায় ডগায় যেন বুদ্ধির

বিচ্ছুরণ। মুখে তাঁর ইংরিজীর তুবড়ি ছুটছে। বেশ একটা নবাবী মেজাজ নিয়ে রীতিমত দরবারী চালে হেলতে দুলতে চলেছেন তিনি।

শুনতে পেলাম একজন সঙ্গীকে উদ্দেশ্য করে বলছেন—আরে থামো, থামো, মেলাই বকবক করো না। জানো এই নিয়ে আমার এখানে তিন তিন বার আসা হলো, এখানকার নাড়ীনক্ষত্র সবই আমার জানা, তুমি তো নিতান্তই শিশু হে। চুপ করে যা বলি তাই শুনে যাও। ঢক ঢক করে পেট ভরে জল খেয়ে নাও, পেট গুলোনো বন্ধ হয়ে যাবে।

অতি মন্থরগামিনী একজন বৃদ্ধাকে হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে দেখে বলে উঠলেন···আ মরণ, এই তাগত নিয়ে এ পথে আবার মরতে আসা কেন? অবশ্য তাঁর কথা বৃদ্ধার কানে যায়নি, পড়ে গিয়ে তক্ষুণি আবার সে নিজে থেকেই উঠে পড়েছে। এমনি করে মোড়লি করতে করতে মহানন্দে দলপতিমশাই সদলবলে আমাদের ছাড়িয়ে উধাও হয়ে গেলেন। রামকৃষ্ণদেবের সেই কথাটি মনে পড়ে গেল—যার যেমন তার তেমন। বেশ তো, যে যার ভাবে থাকুক না কেন, তাতে আমার কী? তোমারই বা কী?

গঙ্গার ধার দিয়েই পথ চলেছে সব সময়। এপার পাহাড় ওপার পাহাড় মধ্যিখানে নদী, উত্তাল উচ্ছল গঙ্গা বহেন নিরবধি। কখনো প্রশস্ত, কখনো বা ক্ষীণ সংকীর্ণ তাঁর কলেবর, কিন্তু তিনি অবিরাম নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে বয়ে চলেছেন—কী অপূর্ব সেই কলধ্বনি! গুরু গম্ভীর নিনাদে আকাশ বাতাস মন্দ্রিত করে চলেছেন, যেন হাজার হাজার শঙ্খ ধ্বনিত হচ্ছে একই সঙ্গে।

পথ চলতি কতো বিচিত্র মানুষের সঙ্গেই না দেখা হয়। আজ একজন অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে পথেই পরিচয় হলো। বন্ধুদের ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে এসেছি। মনে হলো আর বেশী এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না—আমাকে দেখতে না পেলে ওঁরা হয়তো চিন্তিত হয়ে পড়বেন, তা ছাড়া আমি তো একা আসিনি, এসেছি দলের সঙ্গে। সুতরাং ঠিক করলাম সামনে পথের ধারে ঐ যে বড় গাছটা দেখা যাচ্ছে ঐ ওখানে গিয়েই অপেক্ষা করবো

সঙ্গীদের জন্য। গিয়ে দেখি সেখানে আরো একজন আগে থেকেই এসে বসে আছেন।

ধীরে ধীরে তাঁর সঙ্গে আলাপ জমে উঠলো। ভদ্রলোক কিছুতেই তাঁর পরিচয়টি দিলেন না, তবে কথায় কথায় তাঁর জীবনকাহিনীটি প্রকাশ হয়ে পড়লো। ভদ্রলোক বাঙালী। দুই ভায়ের মধ্যে তিনিই ছোট। অতি শৈশবে বাবা মাকে হারিয়েছিলেন। দাদাই তাঁকে মানুষ করেছেন। একমাত্র বালক পুত্রকে রেখে প্রথমে বৌদি তারপর দাদা মারা গেলে ভাইপোটির পুরো দায়িত্ব তাঁরই ওপর এসে পড়ে। ভাইপোটির প্রতি স্নেহ আর কর্তব্য বোধে তাঁর আর সংসার করা হলোনা। তাঁর নিজের সংসার হলে পাছে ভাইপোর প্রতি অবহেলা হয় সেজন্য তিনি নিজে ঘর না বেঁধে মা-বাবা উভয়ের স্নেহ দিয়ে তাকে মানুষ করতে লাগলেন।

ভাইপো ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠলো। তাকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য তিনি পৈতৃক সম্পত্তির যেটুকু তাঁর নিজস্ব অংশ সেটা বিক্রি করে দিলেন। তাঁর দাদার অংশটা ভাইপোর নামে সেটেলমেণ্টে লেখাপড়া করে দিয়েছিলেন, সেটা কিছুতেই বিক্রি করলেন না বা বন্ধক রাখলেন না। নিজের অংশ বিক্রি করেও যখন অকুলান হলো তখন নিজে ধার দেনা করে ভাইপোকে উচ্চশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করলেন। ভাইপো বি.এ পাস করার পর উকিল হলো। তিনি তার বিয়ে দিলেন। বৌ নিয়ে সে জেলাশহরে ব্যবসা শুরু করে দিলে। ক্রমে ক্রমে তার ব্যবসা ফেঁপে উঠলো। দিনে দিনে আয় চললো বেড়ে। এসব দেখে শুনে তাঁর আনন্দ আর ধরে না।

কিন্তু কী যে হলো তিনি জানেন না, নিজের দুর্বুদ্ধিতে অথবা অন্য কারো কুপরামর্শে ভাইপো ক্রমে ক্রমে কাকাকে বিষনজরে দেখতে লাগলো এবং একদিন নিতান্ত একটা তুচ্ছ অছিলায় তাঁকে বলে বসলো— তুমি ঠক বদমায়েস, আমার বাবার সম্পত্তি মেরে ভালোমানুষ সেজেছো, তোমার মতো ভণ্ডের মুখদর্শনও করতে চাইনে আমি।

ভদ্রলোক বললেন—ভাইপোর এ রকম আচরণে আমি দুঃখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কিন্তু পরক্ষণেই আমার চৈতন্যোদয় হলো। বুঝতে

পারলাম—বেশ হয়েছে, আমার মনের ভেতর নিশ্চয়ই একটা অহংকার ছিলো, ছিলো একটা কৃতজ্ঞতা পাবার গোপন লালসা ; সেটা এভাবেই চুরমার হয়ে গেল, ভালোই হলো।

ভাইপোকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে সেই মুহূর্তে শুধু গৃহত্যাগ নয়; একেবারে দেশত্যাগই করলাম। সে আজ আট বছর আগেকার কথা। এই আট বছর ধরে আমি গাড়োয়ালেই আছি। গ্রামে গঞ্জে ঘুরে বেড়াই। কোথাও বা আট দশ মাস থেকে যাই, এদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে পাঠশালা করি। এরা বড়ো সাদাসিধে সরল মানুষ, এদের মনে কোন ঘোর প্যাঁচ নেই, এদের কাছে আমি অফুরন্ত শ্রদ্ধা আর ভালবাসা পেয়েছি।

কিন্তু জানেন মনটা বড়ো বিচ্ছিরি জিনিস, এখনো মাঝে মাঝে ক্ষোভ হয় ভাইপোর দুর্ব্যবহারের কথা চিন্তা করে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগরের কথাগুলিও মনে পড়ে যায়—কেউ তোমার নিন্দে করলে বুঝতে হবে তুমি নিশ্চয়ই তার কোন উপকার করেছো।

বললুম—ঠিকই, তবে নেমকহারামি শুধু কি ব্যক্তিবিশেষের বেলায়ই খাটে? আমার তো মনে হয় সমস্ত মনুষ্যজাতিটাই অকৃতজ্ঞ। তা না হলে যে দুটি প্রাণী নিঃশব্দে আমাদের সব চাইতে বেশী সেবা করে চলেছে সেই গোরু আর গাধাকে আমরা কি এমন তাচ্ছিল্য করতে পারতাম, পারতাম কি অন্যকে গালাগালি দিতে গিয়ে এই দুটি প্রাণীর সঙ্গে তাকে অভিন্ন বলে ঘোষণা করতে? সুতরাং বেচারা ভাইপোটির ওপর মিছিমিছি আর অভিমান করে কী হবে?

ভদ্রলোক বললেন—তা তো ঠিকই, তা তো ঠিকই, কথাটা তো এমন করে ভেবে দেখিনি কোন দিন।

জিগ্যেস করলাম—সত্যি কি আর বাংলাদেশে কখনো ফিরবেন না?

বললেন—ফিরবার তো আর ইচ্ছে নেই। তাছাড়া জানেন তো Inertia বলে একটা প্রাকৃতিক ধর্ম আছে, যার অর্থ—যে যে-অবস্থায় আছে সেই অবস্থাতেই সে থাকতে চায়, সুতরাং এ দেশে থাকতে থাকতে এ দেশ ছেড়ে আর যাবার ইচ্ছে না হওয়াটাই তো স্বাভাবিক।

আমি বললুম—কথাটা সত্যি, কিন্তু পুরোপুরি সত্যি বলি কী করে? তা যদি হতো তাহলে বাংলাদেশ ছেড়ে এদেশে আপনার আসাই হতো না যে। কথাটা পুরোপুরি সত্যি হলে জগতে পরিবর্তন কখনোই আসতো না। Inertia-এর উল্টো change—এটাও যে একটা প্রাকৃতিক নিয়ম।

ভদ্রলোক এগিয়ে গেলেন। আমি বন্ধুদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। ভদ্রলোকের কথাই ভাবতে লাগলুম। তিনি ভাইপোর দুর্ব্যবহারে যে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছেন তা থেকে তাঁর মনে সৃষ্টি হয়েছে গভীর হতাশার (frustration)। হতাশা মানে আশাভঙ্গ। কিসের আশা? এক্ষেত্রে ভাইপোর কাছ থেকে সেবা যত্ন কৃতজ্ঞতা পাবার আশা। কিন্তু কেন? কারণ, তিনি তার ভালোর জন্য সাধ্যাতীত চেষ্টা করেছেন, নিজের সম্পত্তি বিকিয়ে দিয়েছেন, এমন কি নিজের ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা আরাম পর্যন্ত জলাঞ্জলি দিয়েছেন। অন্যকে কেন্দ্র করে আমাদের জীবনে যত অশান্তি তার প্রায় সবটাই এই প্রত্যাশার জন্যই। তাই কারো উপকার করার সময় প্রত্যুপকারের আশা না করেই তা করতে হবে। আশা করলেই আশাভঙ্গের সম্ভাবনা। তাছাড়া প্রত্যাশাযুক্ত পরোপকারকে প্রকৃত পরোপকার বলা যায় কী? পক্ষান্তরে, যার উপকার করা হচ্ছে, উপকারী ব্যক্তি নিশ্চয়ই তার মাথাটা কিনে নিচ্ছেন না, সুতরাং তাঁর প্রতি তার আনুগত্যে কোন বাধ্যবাধকতাও থাকতে পারে না। মোট কথা, যদি প্রত্যাশাশূন্য হয়ে কারো উপকার করতে পারো তো কর, নইলে আশাভঙ্গের জন্য প্রস্তুত থেকো। শান্তি পেতে চাও তো আশা-আসক্তি পরিত্যাগ কর। "ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্"।

কিন্তু এমনটা হয় কেন? কেন উপকৃত ব্যক্তি উপকারীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে? কারণ এটাই তাঁর পাওনা, পরম বিচারক বিধাতা পুরুষের বিচারে, যে বিচারে কোন ভুল থাকতে পারে না, বিধানটা তাঁর ভালো লাগুক বা নাই লাগুক। যাঁর ইচ্ছে ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়ে না তাঁরই ইচ্ছেতে তুমি যার উপকার করেছো সে-ই তোমার অসম্মান করবে, এই অসম্মানের ভেতর দিয়েই তিনি তোমাকে মোহমুক্ত করবেন

যাতে করে একদিন স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে তুমি শাশ্বত সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে পারো।

ভাগ্য সম্বন্ধে আমার এক আত্মীয়ের সুন্দর একটি মন্তব্য মনে পড়ে যাচ্ছে। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল সে ভাগ্য মানে কিনা। উত্তরে সে বলেছিল—ভাগ্য মানি আর না-ই মানি যা হয়েছে তা হয়েইছে, যা হবে সেটাই হবে। সুতরাং ভাগ্য আমার মানা না মানার ওপর নির্ভর করছে না। অতএব যা হবে সেটাই যখন হবে তখন তাকে খুশী মনে গ্রহণ করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ, ক্ষোভ করে কষ্ট পেলে নিজেরই ক্ষতি। সুতরাং আমরা যদি মনে প্রাণে একথাটা মেনে নিতে পারি যে ভালো মন্দ আমার জীবনে যা কিছু ঘটছে তার সবটাই আমার পাওনা তাহলে অশান্তি আর আত্মগ্লানির জ্বালায় আর জ্বলতে হয় না, একজনের ওপর সমস্ত দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে বেশ আনন্দেই থাকা যায়, থাকা যায় নিঃশঙ্ক আর নিরুদ্বিগ্ন হয়ে।

কিন্তু আরও একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে। প্রায়ই দেখা যায়, যে অন্যায় করে সে আবার চোখও রাঙায় এবং তারই জয়জয়কার ঘটে। এই ধরনের লোকরাই বেশী ক্ষমতার অধিকারী হয়, তাদেরই হয় বাড়-বাড়ন্ত। কিন্তু এমন হয় কেন? তাদের অন্যায় প্রবৃত্তিকে বাড়তে দিয়ে তাদের কী এমন উপকার সাধিত হতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর জানি না। তবে শুনেছি শুম্ভ-নিশুম্ভ চণ্ড-মুণ্ড রাবণ-হিরণ্যকশিপুদের তিনি ক্রমান্বয়ে বাড়তে দিয়েছিলেন একদিন তাদের চরম পতন ঘটাবার জন্যই এবং সেই পতনের মধ্যেই ঘটেছিল তাদের পরম আত্মোপলব্ধি। প্রত্যেকের প্রয়োজন তো সমান নয়। চূড়ান্ত বাড় বাড়তে দিয়ে আঘাত হানলে তবেই সে আঘাতে কারো কারো চোখ খোলে, অন্যভাবে তাদের চোখ খোলা যায় না। তাই বুঝি মহিষাসুরকে তিনি বলেছিলেন—"গর্জ গর্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্"।

চড়াই-এর পর চড়াই, আবার চড়াই, তারপর উৎরাই—তারপর আবার আবার আবার চড়াই—এর আর শেষ নেই যেন। পাহাড়ের পর পাহাড়

ডিঙিয়ে চলেছি, তবু পাহাড়ের উচ্চতা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে—আরও উঁচু, আরও উঁচু পাহাড়ে উঠছি—উঠছি তো উঠছিই। কোমর ব্যথা করছে, বুকে চাপ লাগছে, হাত-পা ছিঁড়ে পড়ার উপক্রম, কিন্তু থামবার উপায় নেই, চলতেই হবে—যেতেই হবে এগিয়ে। দেহের ক্লান্তি মনের জোরে জয় করে চলেছি।

কিন্তু এ কাজটা অনেক সহজ হয়েছে আরও একটা কারণে। ছবির পর ছবি দেখতে দেখতে চলেছি যে—প্রতিমুহূর্তে চোখের সামনে ভেসে উঠছে একটি করে নতুন ছবি, যার কোন তুলনাই হয় না। কত ঝর্ণা দেখলাম পথের ধারে—উঁচু, অনেক উঁচু পাহাড় থেকে ক্ষীণ ধারায় নেমে আসছে কোনোটি, কোথাও দুটি ঝর্ণা এমন করে মিশেছে দেখে মনে হয় ঠিক যেন রূপোর হার দুলছে শৈলবালার কণ্ঠে, কোনোটি বা বহু ধারায় বিভক্ত হয়ে বিপুল গর্জনে লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে এসেছে পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত। তাদের দেখে মনে পড়ে যাচ্ছে কবির কবিতা—"ঝর্ণা, ঝর্ণা, সুন্দরী ঝর্ণা, তরলিত চন্দ্রিকা চন্দনবর্ণা"।

আমি প্রায়ই এগিয়ে আছি আমার দলের আর তিনজনের থেকে। অনেক সময় পথে আমি সম্পূর্ণ একা—এদিকে, ওদিকে কেউ কোথাও নেই। কী গভীর গম্ভীর নির্জনতা! চার পাশে স্বর্গীয় সৌন্দর্য—দিনের আলো পড়ে পাহাড়ের গাছপালা ঝলমল করছে। মেঘের ছায়ায় পাহাড়ের একটা দিক হয়তো বা কজ্জলবর্ণ। দূরে নীল পাহাড়। কাছের পাহাড়ে হাজার হাজার ফুট উঁচুতে ঝুম চাষের ধুম লেগেছে—সবুজ সবজির ক্ষেত, পাকা গমের সোনা রঙ স্তরে স্তরে ছড়ানো। পাহাড়ীদের ছোট ছোট ঘরবাড়ি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে যাচ্ছি, না না, সুন্দরকে দেখে, দেখার লোভে থমকে থেমে যাচ্ছি। দু নয়ন মেলে দেখছি অনুপমকে। একটু জিরিয়ে নেবার জন্য একটা পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছি। এখানে এসে এই পাহাড়টাকে ঘুরে বাঁক নিয়েছে পথ, তাই সামনের পথটা আর দেখতে পাচ্ছি না। পেছনের দিকে যতদূর চোখ যায় কেউ কোথাও নেই,

চারিপাশে এক সুমধুর স্তব্ধতা বিরাজমান। নিমগ্ন হয়ে নিসর্গের পাত্র হতে আনন্দসুধা পান করছি রসিয়ে রসিয়ে, এমন সময় অপূর্ব এক সুরের মূর্ছনায় চমকে উঠলাম।

একতারা বাজিয়ে এখানে আবার কে গান গায়? কোথায় সে? পাহাড় ঘুরে দেখি অনতিদূরে একটি প্রশস্ত প্রস্তর ফলকে ঋজু হয়ে বসে আছে গেরুয়া আলখাল্লা পরা বলিষ্ঠ এক বাউল, হাতে তার একতারা। তার গা ঘেঁষে রাস্তার ওপর বসে রয়েছে গেরুয়াপরা একটি কিশোর বাউল। দুজনারই চুল ঝুঁটি করে বাঁধা। মুখ তাদেব উল্টো দিকে, তাই আমাকে তারা দেখতে পায়নি। ধীবে ধীরে আমি তাদের পেছনে এসে দাঁড়ালাম। তন্ময় হয়ে বাউল গাইছে···

মন আমার একতারাতে তাবা তারা গাও
তারা নামের তরী বেয়ে
চলরে মন নেচে গেয়ে
আবার তারা নামের গুণ টানায়ে আপন মনে গাও।
তারা কৃষ্ণ তারা কালী
তারা তো সেই বনমালী
তারা নামের মালা পবে তারা নামটি গাও
তাবা আছে তারাপীঠে
তারা আছে আদ্যাপীঠে
তারা নামের সুধা পিয়ে বিভোর হয়ে যাও।
তারা তারা ডাকলে তবে
তাপিতাঙ্গ শীতল হবে
ঐ তারা তারা তারা সুবে সুরটি সেধে নাও॥

মুগ্ধকণ্ঠে বলে উঠলাম—বাঃ বাঃ কী অমৃতবাণীই না শোনালে ভাই। দুজনে চমকে উঠে ফিরে তাকালো আমার দিকে। বললে—গোসাঁই, তুমি? তুমি এলে কখন?

বললাম, এই তো এলাম ভাই।

বাউলের বয়েস বছর পঁয়তাল্লিশ হবে, বলিষ্ঠ গঠন, নিটোল স্বাস্থ্য, ভাব-ঢুলু ঢুলু আঁখি দুটি, গৌরকান্তি। দূর থেকে যাকে কিশোর ভেবেছিলাম, আসলে সে কিশোরী। কৃষ্ণাঙ্গী তন্বী, নাকটি বাঁশির মতো, চোখ দুটি পদ্মের মতো টানা টানা, ভাসা ভাসা। দুজনেরই গলায় কণ্ঠী, মুখমণ্ডলে রসকলি কাটা।

বললাম—বাউল, কোথায় চলেছো তোমরা ?

সে গুন্‌গুনিয়ে গেয়ে উঠলো—আমরা খুঁজে বেড়াই তারে।

বললাম, কে সে ?

সে বললে—তিনি সুন্দর, আমরা সেই চিরসুন্দরকেই খুঁজে ফিরছি।

আমি বললাম—বাউল, তোমার নামটি কী ?

সে বললে—সুবলদাস।

আর ওর ?

ওর নামটি কুসুমকলি।

কুসুম তোমার কে ?

কুসুম ? কুসুম আমার সবকিছু, সে আমার সাথী, সে আমার আমার-আমি, আমার ভাবের ভাবী, সে যে আমার তারা গো।

বললাম—উঠবে না তোমরা ?

বাউল বললে—না গো গোসাঁই, এখন আমাদের উঠবার জো নেই। আমাদের তো যাবার কোন নির্দিষ্ট জায়গা নেই। তাই কোন ত্বরাও নেই আমাদের। আমরা আনন্দের সাগরে ভাসতে ভাসতে চলেছি। যখন যেখানে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ভাসতে ভাসতে তখন সেখানে চলে যাবো।

মনে হলো নিসর্গ আর মানুষের এই যে বিচিত্র রূপ, এই তো আমার মা, আমার তারা মা। তিনিই গঙ্গা, তিনিই শিব, তিনিই সব। সবই তো তাঁরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ—যেমন বিশাল, যেমন বিচিত্র তেমনি বিস্ময়কর !

ওরা বসে রইলো, আমি এগিয়ে চললাম। এক জায়গায় দেখলাম

পাহাড়ের ওপরে গাছপালার রঙ কী অদ্ভুত রকমের সবুজ—কচি নরম কাঁচা তাজা সজীব সবুজ। তার ওপর চাঁপা আলোর সোনা রঙ ধরেছে। পাখী ডাকছে থেমে থেমে, ঝিল্লী ডেকে চলেছে একটানা, বিরাম নেই। পাহাড় জুড়ে বেতের মতো বেঁটে বেঁটে বাঁশ, সারা অঙ্গে ডোরা কাটা। পাহাড়ের গা বেয়ে সোজা হয়ে উঠেছে অন্যান্য বড় বড় গাছ—বনস্পতি। কী অদ্ভুত নির্জন আর সুন্দর এ জায়গাটা। কিন্তু হিমালয়ের কোন্ জায়গাটাই বা কম সুন্দর?—যেদিকে তাকাও তোমার চোখ জুড়িয়ে যাবে, বুঝতে পারবে কেন হিমালয়কে ভারতাত্মা বলা হয়, কেন তাকে বলা হয় দেবতাত্মা হিমালয়।

এক সময়ে দেখি ফিরতি পথে একজন বৃদ্ধা আসছেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে, মাথায় মস্ত বোঝা। কাছে আসতে বললাম, জয় গঙ্গা মাঈ কী জয়। বুড়িও বললেন, জয় গঙ্গা জী কী। তারপর কাঁদো কাঁদো গলায় যা বললেন তার সারমর্ম হলো, তিনি এসেছিলেন কয়েকজন প্রতিবেশীর সঙ্গে, কিন্তু দলের লোকেরা তাঁকে ফেলে চলে গেছে, তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত, পথ চলতে আর পারছেন না, হাত-পা কাঁপছে, এখন কী যে করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না।

বললাম—মাঈ, এগিয়ে যাও, ওদের দেখা এক সময় মিলে যাবে, থেমে থেকো না। আমি আর তোমার কোন্ কাজে লাগতে পারি বল? আমি তো যাচ্ছি উল্টো পথে। তুমি এগিয়ে যাও।

নিঃসহায়া বৃদ্ধা পা বাড়ালেন সামনের দিকে। বয়েস জিগ্যেস করলুম। বললেন সেই অনেক অনেক আগে পাটনায় যখন ভূমিকম্প হয়েছিল তখন তাঁর ওমর ছিল বারা বয়ষ।

সাথীই বল আর সঙ্গীই বল, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব যাই বল না কেন, সবই তো দুদিনের জন্য—জীবনের রঙ্গমঞ্চে যাত্রা শুরু করেছি একলা, যাত্রা শেষে যেদিন চলে যাবো এই রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে তখনও একাই যেতে হবে। অন্যের সঙ্গে পথে দেখা মাত্র ক্ষণিকের তরে। আমরা সবাই সরাইখানার এক রাতকা সহযাত্রী। সুতরাং তাদের ওপর নির্ভর করাও যেমন মূঢ়তা,

তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা, তাদের ওপর অভিমান করাও তেমনি নিরর্থক। নির্ভর করতে হবে শুধু তাঁরই ওপর 'সকল সময়ে বন্ধু সকলের যিনি'। বন্ধুত্ব পাতাতে হবে তাঁরই সঙ্গে, সংগোপনে তাঁরই সঙ্গে চলবে আমার মান অভিমানের যত পালা, আমার সকল রসের খেলা।

আমি অনেকটা এগিয়ে আছি আমার দলের থেকে। কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না—মন বলছে চলো, দু'চোখ ভরে সুন্দরকে দেখতে দেখতে এগিয়ে চলো। পেছনের সাথীরা তোমার সম্বন্ধে কে কী ভাবছে সে কথা ভাববার তোমার কোন দরকার নেই, তুমি কারো সম্বন্ধে বিরূপ কিছু ভেবো না। গঙ্গা মাঈর কাছে প্রার্থনা কর তিনি যেন তাঁর করুণাস্পর্শে তোমার মনের সকল গ্লানি সমস্ত ক্লেদ ধুয়ে মুছে নির্মল করে দেন। তাঁর রাজ্যে এসে পড়েছো—এর চাইতে বড় প্রার্থনা তোমার আর কিছুই থাকতে পারে না।

মাঝে মাঝে ঘোড়া আর খচ্চর আসছে দল বেঁধে। তাদের গলায় টিনের ঘণ্টা বেজে চলেছে টুং টাং শব্দ করতে করতে। একটি অপূর্ব সঙ্গীতের সৃষ্টি করতে করতে আসছে তারা। কাছাকাছি এলে পথের পাশে সরে দাঁড়াচ্ছি, তবু কখনো সখনো তাদের ধাক্কায় পাহাড়ের গায়ে ঢলে পড়ছি।

এক জায়গায় দেখা হয়ে গেল এক রাজবেশধারী সাধুর সঙ্গে। সোনার মতো গায়ের রঙ। সিল্কের গেরুয়া পরা। মাথায় পাগড়ী, গালভরা কালো চাপ দাড়ি। বিরাট লাঠি মুঠি করে শিষ্য শিষ্যা পরিবেষ্টিত হয়ে হা হা করে হাসির ফোয়ারা ঝরাতে ঝরাতে হন্ হন্ করে ফিরে চলেছেন গঙ্গোত্রী থেকে। সঙ্গে শিষ্যের তুলনায় শিষ্যাই বেশী—বালিকা থেকে শুরু করে প্রৌঢ়া পর্যন্ত, যুবতীর সংখ্যাই অধিক। একজন শিষ্যের কাছে জেনে নিলাম আশ্রম মহারাষ্ট্রে; সাধুর নামটি ঘনানন্দ।

একটা পাহাড় পেরিয়ে আর একটা পাহাড়ে উঠতে যাবার মুখে দেখা হয়ে গেল একটি অপূর্ব সুন্দরী ঝর্ণার সাথে। তার মিষ্টি জল খেলাম, পাত্র ভরে নিলাম, ফটো তুললাম তার পাশে দাঁড়িয়ে। অন্য পাহাড়ে কিছুটা

উঠেই পেলাম একটা ছোট্ট দোকান—চা আর আলুর পকৌড়ী পাওয়া যায়। তাই খেয়ে আবার রওনা দিলাম। সামনে বিরাট চড়াই, পাহাড়কে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে এঁকে বেঁকে পথ উঠে গেছে। অভ্রমেশা পাথরের পাহাড়। পাথর ভেঙে সারা পথে জমেছে অভ্রের ধূলো। সূর্যের আলো মেখে সারা পথ জ্বল জ্বল করে জ্বলছে—যেন মণিমুক্তো দিয়ে তৈরী সে পথ। যে পাহাড়টা পেছনে ফেলে এলাম তার খাড়াই গা বেয়ে খাড়া হয়ে উঠেছে লম্বা লম্বা গাছ একেবারে আকাশ ফুঁড়ে, মাথার ওপর নীল আকাশ, ঘন নীল। নির্মল স্নিগ্ধ নীলাকাশে সাদা সাদা মেঘ ভাসছে। আলোছায়ার অদ্ভুত বুনানি চারিপাশে। তার ওপর পাহাড়ের শীতল বাতাস ঝড় তুলে সর্বাঙ্গে কনকনানি ধবিয়ে দিচ্ছে। সেই ঝড়ে ধূলো উড়ছে চতুর্দিকে। অভ্রের ধূলো। সোনালী রোদ মেখে লক্ষ লক্ষ অভ্রের রেণু উজ্জ্বল তারার মতো বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে একেবারে নাগালের ভেতর। মনে হচ্ছে যেন কোন্ নিঃসীম মহাশূন্যে নক্ষত্রলোকে এসে পড়েছি। স্বপ্ন দেখছি নাকি?

পথের একপাশে দেখলাম বিরাট এক গুহা। দিব্যি তার ভেতর বসে ধ্যান করা যায়। হয়তো কোন সাধু মহাত্মা এককালে থাকতেন এই গুহায়। আজ সেটি পরিত্যক্ত। জায়গাটি ধ্যান ধারণা করারই মতো। ডঃ কর্মকার অনেকক্ষণ ধরে গুহাটি দেখতে লাগলেন। একজন সহযাত্রী বলে গেলেন—গুহার পাশে বেশী ক্ষণ থাকা ভালো নয়। কিন্তু কেন, তা বললেন না, হয়তো বা ইঙ্গিতে সাপখোপ জন্তুজানোয়ারের কথাই বলতে চাইলেন।

এক সময় দেখি গৌরবাবু এগিয়ে গেছেন অনেকটা। আমরা তিনজন শ্লথগতিতে চলেছি। হঠাৎ তিনি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে মাথার ওপর লাঠি ঘুরিয়ে যেন নাচ জুড়ে দিয়েছেন দেখছি। কাছাকাছি গিয়ে বলে উঠলুম—কী ডঃ চৌধুরী, হলো কী আপনার? দেখি তাঁকে কাব্যভূতে পেয়েছে। তিনি গলা ছেড়ে গেয়ে উঠলেন—

তুর্কীনাচন নাচছি মোরা ফুর্তিসে
হাতে মোদের যাদুদণ্ড ঘুরতিসে।

তারপর বললেন— জানেন, এই দণ্ডে যদি আমরা দণ্ডিত না হতুম তাহলে নির্ঘাৎ পতন ও তার ফলে মৃত্যুদণ্ড অবশ্যই জুটতো। তাই—

জয় দণ্ডের জয়

দণ্ডে দণ্ডে ঘোষিব তোমার

আশিস মরণ-জয়।

একসঙ্গে তিনজনে বলে উঠলুন—সা-বা-স। সত্যিই তো এই দণ্ড যদি আমাদের হাতে না থাকতো তাহলে এই দণ্ডেই মৃত্যুদণ্ড নেমে আসতো আমাদের ওপর।

এক বৃদ্ধ আর বৃদ্ধা ফিরে চলেছেন। একজন পথিক জিগ্যেস করলেন ধাবরানী আর কত দূর। বৃদ্ধ বললেন, এখনো অনেকটা পথ বাকি। বৃদ্ধা তাঁকে ধমক দিয়ে বলে উঠলেন—ছি ছি, পুণ্যার্থীকে ভয় দেখাতে নেই, সাহস দাও। বললেন—চলে যাও বাছা, এসে পড়লো বলে।

চলতে চলতে এমন একটা জায়গায় এসে পড়েছি যেখান থেকে এবার দুর্গম সংকীর্ণ খাড়াই ঢাল বেয়ে ঐ যে হাজার দেড়েক ফুট নীচে গঙ্গা বয়ে চলেছেন সেই সেখানে নেমে যেতে হবে। ঘোরানো সিঁড়ির মতো পাহাড়কে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পথ গেছে নেমে। সেই সংকীর্ণ উপলসংকুল পথের দুদিক দিয়ে সমানে ডাণ্ডি কাণ্ডি ঘোড়া খচ্চর আর পদযাত্রীদের আসা-যাওয়ার দ্বিমুখী ধারা সদাই প্রবহমান। একটুকু অসতর্ক হয়েছো কি পড়ে গিয়ে হাড়গোড় ভাঙবে, ঘোড়া খচ্চরে মাড়িয়ে যাবে, নয়তো বা গড়িয়ে পড়তে হবে একেবারে সীমাহীন খাদের ক্ষুধিত মুখের ভয়ংকর গুহার মধ্যে।

এক সময় উৎরাই ভেঙে একেবারে নেমে এলাম গঙ্গার পাশে, হাতে করে জল নিয়ে মাথায় ঠেকালাম। তারপর শুরু হলো আবার চড়াই। কিছুতেই আর পথের শেষ হয়না। যাকে বলি সেই বলে—অউর দো কিলোমিটার, অউর ভি ঢাই। কিন্তু পথের আর শেষ খুঁজে পাইনা যেন, চলতেই থাকি।

ডঃ কর্মকার এক সময় বলে উঠলেন—নাঃ আর পারছিনা, আসা উচিত

ছিল আরও তিরিশ বছর আগে সেই সে যৌবন কালে। ভাবলুম হয়তো বা তাই। কিন্তু তখন এলে কি আজকের এই অনন্য সাধারণ অভিজ্ঞতাটি ঘটতো আমার জীবনে? কিছুতেই তা ঘটতো না। কিন্তু তাতেই বা কী? তখন যে অভিজ্ঞতাটি ঘটতো সেটিও কি কিছু কম আকর্ষণীয় হতো? নিশ্চয়ই না, কারণ যখনই আসো না কেন, হিমালয়ের শাশ্বত সুন্দর রূপটি তোমার চোখে পড়বেই পড়বে। কথাটা সত্যি, কিন্তু এ কথাটাও তো সমান সত্যি যে হিমালয়ের সেই শাশ্বত রূপটি বহু বিচিত্র—তার থৈ পাওয়া যায় না। এখন এই মুহূর্তে তার রূপের যে দিকটি তোমার চোখে পড়ছে তখন হয়তো সেটি তোমার দৃষ্টি এড়িয়ে যেত। সুন্দর তো অনেক আছে, কিন্তু যে সুন্দরটিকে একান্ত আপন করে পেয়েছি তার ওপর একটি বিশেষ মায়া পড়ে গেছে যে। আজকের এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনে কখনোই আসতো না এ যে আমি ভাবতেও পারিনা, ভাবতে চাইও না। তাছাড়া কষ্ট করে ঝুঁকি নিয়ে যে আনন্দ উপার্জন করলাম তার মূল্য আমার কাছে যে অনেক অনেক গুণ বেশী। সর্বোপরি সেই পরম গানিতিকের হিসেব মতো আজকেই তো আমার এখানে প্রথম হয়তো বা শেষও) আসবার কথা, এর আগেও নয় পরেও নয়। আমি চাইলেই তো আর হবে না। তিনি যখন যা চাইবেন তাই তো হবে।

অবশেষে ধাবরানীর কাছাকাছি এসে পড়লাম। ঐ যে কাঠের ব্রীজটা ওটা পেরোলেই যে ঘরবাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে ঐটা নিশ্চয়ই ধাবরানী হবে। নীচে তাকিয়ে দেখি গঙ্গার জল সবুজ –ঠিক সবুজ নয় তার সঙ্গে বোধ করি শ্বেত চন্দন গোলানো হয়েছে। কিন্তু একি, গঙ্গা কি ঠাণ্ডায় এখানে জমে গেছে নাকি? ঠিক সবুজ জলের পাশে বরফ জমেছে—জল জমে ধপ্ ধপ্ করছে। পাশেই রাস্তা মেরামতির কাজ চলছিল। একজনকে শুধোলাম সত্যি সত্যি গঙ্গার জল জমে বরফ হয়ে গেছে নাকি। সে বললে—না না, ও তো চড়া, সাদা নুড়ি আর বালু দিয়ে গড়া। এত স্বচ্ছ সাদা নুড়ি আর বালিও হতে পারে! আশ্চর্য, একটা জায়গাতেই বা এত সাদা বালি আর নুড়ি জমলো কী করে? নদীর মধ্যে দেখছি দুটো মরা

ঝাউগাছকে ঘিরে জল উদ্দাম বেগে ঘুরপাক খাচ্ছে, আর ঘুরন্ত জলের তোড়ে অজস্র ফেনার সৃষ্টি হয়ে চলেছে।

পা আর যেন চলছে না। কোন রকমে নিজেকে টেনে নিয়ে চলেছি। বন্ধুরা অনেক পেছনে। কিছুটা এগিয়ে দেখি পথের ওপর খাদের কিনার ঘেঁষে বসে আছে এক যুবক আর এক যুবতী। স্বামী স্ত্রী হবে মনে হয়। পোশাক পরিচ্ছদ দেখে বিহারী বলেই মনে হলো। যুবকটির মাথায় বেশ বড় রকমের একটি পাগড়ী। আধো ঘোমটাপরা যুবতীটি আক্ষেপের সুরে কাঁদতে কাঁদতে কী যেন বলে চলেছে। কাছে গিয়ে বললাম— রোতি কিঁউ ভাই, ক্যা হুয়া তুম্‌হারা? উত্তরে জানা গেল— ওখানে ওরা ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিতে বসেছিল। কিছু খাওয়া দাওয়ার পর বউটি তার ঘটি ধরে জল খাচ্ছিল. হঠাৎ হাত ফস্কে সেটি খাদের ভেতর পড়ে গেছে। তাই এত কান্না, ঘটিটা বউটির বড়ো আদরের ছিল। বলছে— মেরা লোটা উঠা দো, ন দো তো ম্যা মর যাউঁ। কিন্তু ঘটি অতল তলে গড়িয়ে পড়েছে, সেটি তুলে আনা বেচারী স্বামীর পক্ষে একেবারেই অসাধ্য, তাই সে খুব অসহায় বোধ করছে। বউকে কিছুতেই সামলাতে পারছে না।

মোহ কী ভয়ংকর জিনিস! সামান্য একটা ঘটির জন্য নিজের প্রাণ পর্যন্ত দিতে চাইছে মেয়েটি। যে বস্তুকে কেন্দ্র করে মোহের সৃষ্টি হয় সেটি সামান্য অসামান্য যাই হোক না কেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে সেই মুহূর্তে সেটিই হয়ে ওঠে সব চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য রাজ্য রত্ন সন্তান স্ত্রী এদের জন্যও যেমন মানুষ প্রাণ দেয়, তেমনি আবার সামান্য তুচ্ছ বস্তুর জন্যও সে আত্ম বিসর্জন দিতে পিছপা হয়না। মোহের বস্তুর জন্য যুদ্ধবিগ্রহ রক্তারক্তি হানাহানি কী না হয়। ভারতের মতো ঋষিও সামান্য একটা হরিণ শিশুর মোহে পড়ে সাধনভজন পর্যন্ত ভুলতে বসেছিলেন। মোহ থাকবে, মোহ থাকুক। তবে যদি তাকে নশ্বর বস্তু থেকে তুলে নিয়ে পারতাম সেই বাউলের চিরসুন্দরের ওপর আরোপ করতে তাহলে জ্বালা যন্ত্রণা শোক তাপ কিছুই আর থাকতো না, এক অনাবিল

আনন্দে অনুক্ষণ ভরপুর হয়ে থাকতে পারতাম, কারণ তিনি তো আর হারাবার বস্তু নন।

মেয়েটিকে বললাম—বহন, মত্ রোনা। মেরা মালুম হোতা কী গঙ্গা মাঈ তুম্‌হারা লোটা ভেট লে লিয়া, ইয়ে তো খোশী কী বাত, তুম্ তো পুণ্যবতী হো। মনে হলো কথাগুলি বউটির মনে ধরেছে। খুশিতে তার চোখ মুখ ঝলমল করে উঠলো। আমি এগিয়ে চললাম, ওরা তখনো বসে।

নাঃ আর বেশী এগিয়ে কী হবে? বন্ধুরা আসুন। এক সঙ্গে হাঁটবো? বেশ ক্লান্তিও লাগছে। পথের পাশে সরে দাঁড়ালাম। পাশ কাটিয়ে কতো লোক চলে গেল। ঐ বউটি আর স্বামীটিও গেল এগিয়ে। বেশ কিছুক্ষণ পরে বন্ধুরা এসে পড়লে তাঁরাও খানিক বিশ্রাম নিলেন। তারপর সকলে মিলে আবার চলতে শুরু করলাম।

ব্রীজের কাছাকাছি যখন এসে পড়েছি তখন দেখি ডান পাশে পাহাড়ের একটা গুহা মতো জায়গা—ঠিক গুহা নয়, মাথার ওপর পাহাড়, তলার তিনটে দিকই খোলা। সেখানে বড় বড় কাঠ জ্বেলে এক কৌপীনধারী সাধু আগুন পোহাচ্ছেন, আর গুন্ গুন্ করে গান গাইছেন। সামনে একটা কাপড় পাতা, তার ওপর একটি ঠাকুরের ছবি আর একটি কুঠার, হয়তো বা কাঠ কাটবার জন্যেই। কাপড়ের ওপর যাত্রীদের দেওয়া টাকা পয়সা সিকি আধুলি ছড়ানো। সঙ্গীদের সঙ্গে আমিও দিলাম সামান্য কিছু। তাঁরা এগিয়ে গেলেন। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম সাধুজীকে।

এই প্রচণ্ড শীতে কৌপীনমাত্র সম্বল করে মহানন্দে মশগুল হয়ে আছেন সাধুজী মহারাজ। সারা অঙ্গে ছাই মাখা। কিছুক্ষণ পরে আমার দিকে চোখ তুলে গেয়ে উঠলেন—

ইয়ে দো দিনকা মেল হ্যা লালাজী
দো দিনকা মেল।
একদিন হ্যায় আনাকো
অউর যানাকো একদিন, লালাজী
দো দিনকা মেল॥

বললুম—নেহি জী, দো দিন নেহি। ইয়ে হ্যায় তিন দিনকা মেল—একদিন আনাকো, একদিন ঠ্যারনাকো, অউর যানাকো একদিন। সাধুজী হাততালি দিয়ে উঠলেন। উচ্ছ্বসিতভাবে সমর্থন জানিয়ে বললেন—ঠিক হ্যায় শেঠজী আপনী বাত। সাধুজী বললেন এই পাহাড়গুলিতেই তাঁর দোদিনকা ডেরা, তিনি কেদার বদরী যমুনোত্রী গঙ্গোত্রী গোমুখ হয়ে ফিরে চলেছেন তাঁর আশ্রমে—নেপালের পশুপতিনাথের দরবারে। নাম তাঁর স্বতন্ত্র গিরি। 'নমো নারায়ণায়' বলে বিদায় নিলাম সাধুজীর কাছে।

কয়েক পা এগিয়ে দেখি সে এক অবাক কাণ্ড! বাঁ দিকে গঙ্গার মধ্যে একটা পাথরের ওপর বসে আছে একটি নিঃসঙ্গ পাখী। হালকা এতটুকু একটা পাখী, আকারে খঞ্জন পাখীটির মতো। রঙটি কালো, ডানার তলাটি সাদা। থেকে থেকে সে সারা গা ডুবিয়ে চান করছে গঙ্গার জলে, তারপর উঠে বসছে আবার সেই পাথরের ওপর। আশ্চর্যের কথা প্রচণ্ড খরস্রোতা গঙ্গার যে জায়গায় সে ডুব দিচ্ছে ঠিক সেই জায়গাতেই ভেসে উঠছে কিছুক্ষণ পরে, কী করে কে জানে!* সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল বামা ক্ষ্যাপার ** সেই উক্তিটি তাঁর প্রিয় কুকুরগুলির সম্বন্ধে। নগেন পাণ্ডাকে তিনি বলেছিলেন—"এই তো তোমার বুদ্ধি গো,—তাই বলচি। কুকুর কি মানুষ লয়, মা জগদম্বার সৃষ্টি লয় বটে?" তিনি বলেছিলেন শাপভ্রষ্ট সাধকেরাই তো তারাপীঠে কুকুর হয়ে জন্মেছেন। কে জানে এই পাখীটিও পূর্বজন্মে কোন পুণ্যাত্মা সাধক ছিলেন কিনা!

এগিয়ে চললাম ঐ ঘরগুলোর দিকে, মনে হলো চলার বুঝি বা শেষ হলো—কিন্তু না, এটাও ধাবরানী নয়। ধাবরানী আরও এক কিলোমিটার দূরে। বাঁক নিয়ে এগিয়ে চলি। ডাইনে গঙ্গা, বাঁয়ে পাহাড়, এখানে গঙ্গার কী অপরূপ শোভা! গঙ্গার ওপারেও পাহাড়—ভীষণ শক্ত ইস্পাতের

---

* ফিরবার পথেও ঠিক ঐ জায়গায় ঐ পাখীটিকে একই কাণ্ড করতে দেখেছিলাম। বন্ধুরাও তা লক্ষ্য করেছিলেন।

** তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ, ২য় ভাগ—প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত।

চেয়েও কঠিন পাথরের নিরেট পাহাড় পর পর খাড়া হয়ে উঠে গেছে আকাশে, তাদের বুক বেয়ে সিধা হয়ে উঠেছে বড় বড় চীর আর পাইন গাছ। নদীর জলে বিশালকায় রাশি রাশি প্রস্তরখণ্ড—বড় বড় বোল্ডার। কোনোটাকে দেখতে লাগছে প্রকাণ্ড এক কৃষ্ণবর্ণ ষণ্ডের মতো, কোনোটা বিরাট হস্তীর মতো, কোনোটাকে বা জলহস্তীর মতো দেখতে। একটা বিরাট গোল পাথরকে ঘিরে অবিরাম জল খর বেগে পাক খেয়ে চলেছে। তার সারা অঙ্গে রেখার বেষ্টনী—দেখে মনে হয় বিশাল একটি শালগ্রাম শিলা বুঝি।

মনে হয় এ যেন এক বিচিত্র রাজ্য। মানুষজন না থাকলে এখানকার পাথরের হাতি ঘোড়া দেবদেবী সকলেই জীবন্ত হয়ে ওঠে, যেই মাত্র মানুষের পদার্পণ ঘটে এ রাজ্যের ত্রিসীমানায় অমনি তারা নিমেষে আবার পাথর হয়ে যায়। যদি কখনো নির্জন চাঁদনী নিশুতি রাতে সন্তর্পণে এসে এ রাজ্যের সীমানা ঘেঁষে দাঁড়াতে পারো তাহলে নিশ্চয়ই একটা অলৌকিক জগতের দুয়ার খুলে যাবে তোমার চোখের সুমুখে, সে রাজ্যে অসম্ভব বলে কিছুই নেই, সেখানে অস্তিত্ব আর চেতনার মধ্যে কোথাও কোন সীমারেখা টানা যায়না।

ধাবরানী পেঁ ীছোলাম প্রায় সাড়ে তিনটেয়। এখান থেকে বাসে করে যেতে হবে লঙ্কায়। দুপুর থেকে বাস আসেনি। একটা মাত্র এসেছিল সকালের দিকে, কিন্তু সেটাও খারাপ হয়ে পড়ে আছে। যাত্রীর দল বাসের জন্য আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে—সবাই ক্লান্ত, লঙ্কা গিয়ে বিশ্রাম নেবে। সমস্ত জায়গাটা জুড়ে লোকজনের ঠাসাঠাসি। তারই মধ্যে ভেড়া ছাগল ঘোড়া খচ্চরের অবিশ্রান্ত আনাগোনা। সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুত আশ্চর্য দৃশ্য। এখানে আলাপ হলো একটি নেপালী কুলীর সঙ্গে। নাম তার ধন বাহাদুর—কতো সরল ভদ্র আর বিনয়ী সে। তার সাহায্য নিলেও 'জী হুজুর', তাকে প্রত্যাখ্যান করলেও 'জী হুজুর', অথচ আমরা কোথায় একটু আরামে থাকবো, কী খাবো সে বিষয়ে তার যত্ন আর চেষ্টার এতটুকুও ত্রুটি নেই।

ঐ যে দেখছি একটা বাচ্চা মেয়ে একা একা পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে আবার নেমে আসছে রাস্তার ওপর। এটাই তার খেলা।

ধাবরানীতে সন্ধ্যে নামলো। পাহাড়ে সন্ধ্যে নামা দেখার মতো। ধীরে ধীরে পাহাড়গুলো অন্ধকার হয়ে আসছে. গাছপালার রঙ বদলাচ্ছে —কাছের পাহাড় হাল্কা ধূসর, তার ওপাশেরটা গাঢ় ধূসর, তারও ওপাশেরটা কালো। থম্ থম্ করছে দিক দিগন্ত।

অবশেষে বাস এসে গেল। হুড়োহুড়ি করে চড়ে বসলাম। সব জায়গাতেই নাম লিখিয়ে বাসে উঠতে হয়। যাত্রীরা সবাই অধৈর্য। কেউ কেউ রীতিমত ক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিতও। বাস ছাড়লো পাঁচটায়। হৃষীকেশ থেকে গাংনানী এসেছিলাম বাসে করে পাহাড় ডিঙোতে ডিঙোতে, সেটাও ছিল বিপদসঙ্কুল পথ। কিন্তু ধাবরানী থেকে লঙ্কার পথটা আরও অনেক ভয়ংকর, অনেক বেশী বিপজ্জনক। ভয়ংকর সব বাঁক নিতে নিতে বাস ছুটে চলেছে চড়াই উৎরাই ভেঙে—পথের একপাশে হাজার হাজার ফুট উঁচু পাহাড, আর একপাশে হাজার হাজার ফুট নীচে গঙ্গার অববাহিকা — মাত্র দু-এক হাত সরে গেলেই বাস পড়বে খাদে। ড্রাইভার অদ্ভুত দক্ষ না হলে এসব পথে বাস চালানো কিছুতেই সম্ভব নয়। একটু অন্যমনস্ক হলে, হাত একটু নড়ে গেলেই সব শেষ। তার ওপর কী ভয়ানক আর আকস্মিক সব বাঁক! হঠাৎ হঠাৎ ওপাশ থেকেও বাস অথবা লরি এসে পড়ছে হর্ণ না দিয়েই। তাদের জায়গা দিতে গিয়ে আমাদের বাসকে দাঁড়াতে হচ্ছে একেবারে কিনার ঘেঁষে।

দূরে দেখছি পাহাড়ে সন্ধ্যে নেমেছে, অথচ বাসের সামনে পেছনে প্রচণ্ড আলো। তবে কি বাসে ফ্লাড্ লাইট জ্বালিয়ে ড্রাইভারকে পথ দেখানোর ব্যবস্থা আছে নাকি? কিন্তু অনেকক্ষণ পরে আমাদের ভুল ভাঙলো। ঠাণ্ডা বাতাস আর বৃষ্টির ছাট থেকে রক্ষে পাবার জন্য বাসের দুপাশের সমস্ত জানালাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তাই রঙীন কাঁচের ভেতর দিয়ে দুপাশের পাহাড় নদীকে অন্ধকার লাগছিল। সামনের আর পেছনের কাঁচগুলো রঙীন ছিল না বলে তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল দিনের উজ্জ্বল

আলো। তবে যে ধাবরানীতে দেখে এলাম সন্ধ্যে নেমেছে। ডঃ কর্মকার বললেন, না ধাবরানীতে সন্ধ্যে নামেনি, মেঘ করেছিল। হয়তো বা ঠিক। কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে তা নয়, আমরা অনেক পশ্চিমে চলে এসেছি যেখানে এখনো সন্ধ্যে নামেনি, ঠা ঠা করছে দিনের আলো। কার কথাটা সত্যি কে জানে!

সেই রকম কতো যে ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে চলেছি আমরা পরস্পরের সম্বন্ধে, আর এই জন্যই না আমাদের মধ্যে এত বেশী ভুল বোঝাবুঝি, মারামারি আর হানাহানি। কিন্তু সত্যের সন্ধান মিলবে কেমন করে? মনের রঙীন জানালাগুলো খুলে দাও, সংস্কারমুক্ত হও, স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ কর, তাহলেই কৃত্রিম অন্ধকার সমস্ত রকমের ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়ে সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে তোমার চেতনায়।

রাস্তায় পাহাড়ের কোলে দুটি চমরী গাই দেখতে পেলাম। নিথর দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। এই সেই চমরী গাই যাদের লেজের লোম দিয়ে তৈরী হয় চামর যা দিয়ে দেবদেবীর বিগ্রহকে ব্যজন করা হয়।

পথে পড়লো হর্সিল—প্রশস্ত সমতল ক্ষেত্রে জনপদটি গড়ে উঠেছে। চারিপাশে সবুজ শস্য ক্ষেত্র, বাড়ির দাওয়াগুলি উঁচু উঁচু। এখানে প্রচুর লোক ওঠানামা করলো। বেশ একটি বর্দ্ধিষ্ণু জায়গা। হর্সিলের আর এক নাম হরিপ্রয়াগ। এখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের একটি বিখ্যাত মন্দির আছে। এখান থেকে তিব্বতের সীমান্ত খুব বেশী দূরে নয়।

লঙ্কার কাছাকাছি যত আসছি ততই ঠাণ্ডার কনকনানি বাড়ছে। এক জায়গায় এদেশের যাত্রীরা বললে—এখানে দু-একদিন আগে বরফপাত হয়ে গেছে। তাকিয়ে দেখি তখনো পথের দু'পাশে পাথরের গায়ে বরফ জমে আছে। লঙ্কায় যখন পৌঁছোলুম তখন সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে, পাশের পাহাড়টার গায়ে মেঘ ভাসছে ধোঁয়ার মতো।

চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা সমতল এক টুকরো জমি লঙ্কা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮৭০৩ ফুট উঁচুতে। পুলিশ স্টেশন আছে, ট্যুরিস্ট লজ (টিনে

ছাওয়া) আছে। আস্তানা পাওয়া গেল যেখানে সেটা আমাদের পছন্দ হলো না। ট্যুরিস্ট লজে চেষ্টা করেও ঠাঁই মিললো না। তখন ডঃ চৌধুরীর ব্যবস্থাপনায় এসে উঠলাম এক হোটেলে। কিন্তু হোটেলের চেহারা যা, তা কোন অংশেই গাংনানীর তাঁবুর চাইতে উন্নত নয়। বিরাট একটা চালার তলায় গোটা তিনেক হোটেল। চালাটা তিরপলের, আর দুটো হোটেলের মাঝখানের দেয়ালটা চটের। হোটেলের একপাশে শোবার ব্যবস্থা, অন্যপাশে রান্নাবান্না চলছে। রোটি, আলু ভাজি, আলু পকৌড়ী, আলুবড়ির সবজি, কাঁচা টম্যাটো, দুধ, চা ইত্যাদি সহযোগে কয়েক দফায় আহার সমাধা হলো। এদেশে তরকারি খুবই কম জন্মে। লোকেদের অবস্থাও ভালো নয়—কঠোর জীবন, মাটি নেই, পাথর ভেঙে ফসল ফলাতে হয়। এর বেশী খাবার এখানে আশা করাটাই অন্যায়। আহারের পর শয়নের আয়োজন। লেপ তোশক মিললো হোটেলেই, আমাদের নিজস্ব তো কিছু ছিলই। যত গরম পোশাক এনেছি তার প্রায় সবই গায়ে চড়িয়েছি—তবু শীতের কনকনানি যেন কিছুতেই আর থামতে চাইছে না।

অনেক রাত হয়ে গেছে—প্রায় সাড়ে এগারোটা। আমার আশেপাশে সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। একা আমিই শুধু লিখে চলেছি। কেন লিখছি জানি না—লিখতে ভালো লাগছে তাই লিখছি। অবশ্য আসবার সময় কঙ্কণ কাকলী আর তাদের শিবু মামা অনেক করে বলে দিয়েছে নিয়মিত রোজ নামচা লিখতে। বন্ধুরাও তাই বলেছেন। সকালে রাজকুমার গর্গ আমি ডাইরী লিখছি শুনে হেসেই খুন। বললাম—কেন, হাসি কেন? অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে গর্গ মন্তব্য করলো—এটা একটা হবি হতে পারে, কিন্তু তারই বা দরকার কী? বললাম—সে কী কথা, যা দেখছি যা শুনছি সবই কি মনে থাকবে? এই যে তোমার সঙ্গে পরিচয় হলো তোমার কথাও লেখা থাকবে আমার ডাইরীতে। অনেক দিন পরে যখন আবার পড়বো আমার ডাইরী তখন তোমার কথাও মনে পড়ে যাবে, ঠিক কিনা বল? তা নাহলে তোমার কথা তো ভুলেও যেতে পারি। খুঁটিনাটি সব কথা, সবার কথা, সকল দৃশ্য কি মনে থাকে? এবার যেন

কথাটা মনে ধরলো গর্গের। তাকে যেন বেশ ভাবিয়ে তুললো আমার কথাগুলি।

তোমার ভালো লাগুক বা নাই লাগুক আমি তো লিখে রাখবো আমার এই অমূল্য অভিজ্ঞতার কথা, লিখে রাখবো আমার দেখা ছবিগুলি, যদিও জানি কোন ছবিই ছবির মতো লেখা যায়না, আবার অনেক ছবিই বাদ পড়ে যায় লেখা থেকে। তবু চেষ্টা করছি লিখে রাখতে যতটা পারি—ভবিষ্যতে আমার মনের এই আনন্দকে যখন খুশি তখন আবার ফিরিয়ে আনবার জন্য লিখছি, আর লিখছি তাদের আনন্দের জন্য যারা আমাকে বলেছে প্রতিদিনের খুঁটিনাটি অভিজ্ঞতার কথা তাদের জন্য লিখে রাখতে। অন্য কেউ যদি আমার ডাইরী পড়ে আনন্দ পায় সেটা হবে নিছকই আমার উপরি পাওনা।

ঘুম ভাঙলো ভোর বেলায় পাশের হোটেলের মহিলা যাত্রিনীদের গানের সুরে। একই সুরে সমস্বরে তাঁরা ভজন গাইছিলেন একের পর এক—

যমুনা কী গঙ্গা কী নারায়ণ কী জয়
গোপাল গোবিন্দ হরিকী জয়॥
যমুনাকী জয়, গঙ্গাকী জয়
রাধারমন জীউ নারায়ণকী জয়॥

*   *   *   *

হরি নাম ভজন করো মন অভিমানী
হর নাম ভজন করো মন অভিমানী

ইত্যাদি।

সত্যিই তো এসে পড়েছি গঙ্গা যমুনার গোদ দরবারে—তাঁদের তো বেশী করে স্মরণ করতেই হবে, ভেট দিতে হবে মনের ভক্তি উজাড় করে,

নইলে তাঁদের করুণা পাবো কেমন করে? কিন্তু হায় রে মূঢ় মন, সব সময়ই তুমি আত্মাভিমানে ডগমগ হয়ে আছো, কী প্রচণ্ড তোমার অহংকার, তোমার অহংবোধ—ভক্তি তোমার কোথায়? যেটুকু ভক্তি আছে ভাবছো সে তো তোমার অহংকারেরই ভাবনা মাত্র। সত্যিকারের ভক্তি মানে তো তাঁকে পাবার জন্য উদগ্র ব্যাকুলতা। ব্যাকুলতার ছিটেফোঁটাও কি তোমার আছে? তোমার নম্রতা তোমার ভদ্রতার মধ্যেও যে তোমার অহংকার তোমার আত্মাভিমানই উঁকি মারছে। তোমার ভক্তি যে তোমার অহংকারেরই রূপান্তর মাত্র কখনো কি তা টের পেয়েছো? আত্মবিশ্লেষণ কর, ঠিকই পাবে। তাড়িয়ে দাও তোমার অভিমানকে, একেবারে মূলোৎপাটন কর তোমার অহংকারের, তবেই না তোমার ওপর নেমে আসবে হরি আর হরের শক্তি যমুনা গঙ্গার করুণাধারা, সরস হবে তুমি, প্লাবিত হবে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অমিয়-মধুর অনুভূতিতে।

বাইরে বেরিয়ে দেখি কী আশ্চর্য সুন্দর স্নিগ্ধ একটি সকাল! পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় গায়ে গায়ে, গাছের মাথায় পাতায়, ঘরের চালায় বরফ জমে আছে, সূর্যের কাঁচা আলোয় ঝলমল করছে দশদিশি, চারিপাশে সে এক-সুগভীর প্রশান্তি: রাত্তিরে কখন তুষারপাত হয়ে গেছে বুঝতেই পারিনি। তবে দু-একবার ত্রিপলের ফুটো দিয়ে শীতল জল বিন্দু এসে পড়েছিল মুখের ওপর, আর শীতটা ছিল ভয়ংকর রকমের জোরালো।

সামনে দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে উঁকি মারছে আর একটি বিরাট পাহাড়—চীর পাইন আর দেওদার গাছ জন্মেছে সারা পাহাড় জুড়ে। ওপরে নীল নীল আরও নীল আকাশ পাহাড় চূড়ার তুষার পুঞ্জের জন্য একটি আশ্চর্য সুন্দর পটভূমি রচনা করেছে—থেকে থেকে সেই দৃশ্যটিকে আরও রমণীয় করে তুলছে তুষার শীর্ষে ভেসে আসা খণ্ড খণ্ড সাদা সাদা মেঘ—সূর্যের আলো মেখে বিশ্বভুবন ঝলমল করছে, চারিদিকে বিকীর্ণ হচ্ছে একটি অপরূপ রূপচ্ছটা!

তিন কিলোমিটার পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে তবে আমাদের হাজির হতে হবে ভৈরোঁঘাটিতে, সেখান থেকে বাস মিলবে গঙ্গোত্রীর। হোটেলের

মালিক দিলীপ সিং-এর মধ্যস্থতায় আমাদের সাথী হলো মুন্সিরাম (রাম তার পদবী)। সমগ্র পাহাড়ী অঞ্চলেই আজকাল কুলী, ডাণ্ডি কাণ্ডি, ঘোড়া খচ্চর যা-ই ভাড়া কর না কেন সরাসরি তা করতে পারবে না। তোমাকে এজন্য দালালের মাধ্যমে স্থানীয় রেজিস্টার্ড সংস্থার সাহায্য নিতে হবে। সংস্থার নির্ধারিত হারেই ভাড়া দিতে হবে। শ্রমিকদের আয়ের একটা অংশ সংস্থার প্রাপ্য। শ্রমিকেরা তাই মোটাসোটা বকশিশ প্রত্যাশা করে, কারণ বকশিশের আয়টা পুরোপুরি তাদেরই নিজস্ব।

মুন্সিরাম বাইশ বছরের তাজা সিধা বলিষ্ঠ যুবক—সে-ই আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবে গঙ্গোত্রী হয়ে গোমুখ পর্যন্ত, আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবে লঙ্কায়। রফা হলো দিন প্রতি তিরিশ টাকায়। হাসিখুশি জোয়ান ছেলে মুন্সিরাম। উত্তরকাশী থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে ক্রউলী গ্রামে তার বাড়ি। দুই ভাই, মুন্সিরামই বড়। চার বোন, দুজনের বিয়ে হয়ে গেছে। বাবা মা বেঁচে আছেন। ক্ষেত খামার আছে, গোরু আছে, মোষ আছে চারটে। অক্টোবর থেকে মার্চ এপ্রিল পর্যন্ত এ অঞ্চলে কেউ থাকেনা। তখন বরফ পড়ে আট দশ ফুট। সব্বাই পালিয়ে যায় নীচে, গরম পড়লে আবার উঠে আসে। শীতের সময় মুন্সিরামও চলে যায় তার বাড়ি, ভাই-বোন বাবা-মায়ের কাছে।

মুন্সিরাম ছাড়া আর একটি কুলীও আমাদের করতে হয়েছে, সে ভৈরোঁঘাটিতে আমাদের মাল-পত্তর পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবে। ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলে গেল সে।

কী ভারি বোঝা অনায়াসে পিঠে বেঁধে মুন্সিরাম চলেছে আমাদের সঙ্গে —এতটুকুও ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই তার। মুখে আনন্দের হাসিটি ফুটেই আছে। মুন্সিরাম হন্ হন্ করে আমাদের ছাড়িয়ে অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছে, তারপর অপেক্ষা করছে যতক্ষণ না আমরা তার নাগাল পাই ততক্ষণ পর্যন্ত।

পাহাড়ী লোকেরা, এমন কি তাদের মধ্যে যারা কিশোর বালক কিংবা রীতিমত বৃদ্ধ তারাও, কী বিরাট বিরাট ভারি বোঝা পিঠে বেঁধে প্রকাণ্ড

প্রকাণ্ড চড়াই উৎরাই ভেঙে কেমন করে অনায়াসে বয়ে নিয়ে যায় দেখলে অবাক হতে হয়, না দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করা যাবে না যে একটা মানুষ কখনো এতো ভার বইতে পারে। পিঠের সঙ্গে বিরাট বিরাট বোঝাগুলোকে পরিপাটি করে বাঁধারও বিশেষ একটা কায়দা আছে। শক্ত দীর্ঘ রশিকে নানাভাবে গিঁটগাঁঠ দিয়ে আশ্চর্য রকমের নৈপুণ্য আর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে খানিকটা শুয়ে খানিকটা বসে, খানিকটা বাঁয়ে খানিকটা ডাইনে হেলে, কখনো বা গাছের গুঁড়িতে অথবা পাহাড়ে কিংবা আর কিছুতে হেলান দিয়ে চোখের পলকে একটা লোক কেমন করে বিরাট বিরাট বোঝা তার পিঠের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে মাটিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো পথ চলার জন্য প্রস্তুত হয়ে দেখলে অবাক লাগে। কাণ্ডিওয়ালাদের কাণ্ডটাও আশ্চর্য। এতটুকু পাতলা একটা মানুষ কী করে যে এত মোটা আর ভারি আর একটা মানুষকে পিঠে বসিয়ে অবলীলাক্রমে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ভেবেই পাওয়া যায় না। বসার ব্যবস্থাটাও অদ্ভুত। বেত কিংবা বাঁশের মোড়ার মতো চেয়ার। যে পথে যেতে হবে তার উল্টো দিকে মুখ করে তোমাকে উঠে বসতে হবে কাণ্ডিওয়ালার পিঠে বাঁধা সেই চেয়ারটায়, যা-কিছু উঁচু একটা জায়গা থেকে, সেটা পাহাড়ের কোণা হতে পারে অথবা পথের কিনারও হতে পারে। পথের কিনার হলে ভয়ে তোমার বুক দুরু দুরু করবে, কারণ পথ থেকে খাদের দিকে এক টুকরো দাঁড়াবার মতো জায়গা পেয়ে নেমে দাঁড়িয়েছে কাণ্ডিওয়ালা, তুমি চেয়ারে ঠিকঠাক হয়ে বসা মাত্রই তোমাকে সুদ্ধ নিয়ে এবার সে উল্টো দিকে ঘুরে নিমেষে পথের ওপর উঠে আসবে, মুহূর্তের মধ্যে তুমি দেখবে তোমার ঠিক তলায় মাটি নেই, আছে হাজার হাজার ফুট গভীর খাদ। পথে উঠতে গিয়ে যদি কাণ্ডিওয়ালার পা হড়কে যায় তাহলে তোমাকে নিয়েই সে পড়বে সেই অতল খাদে। তবে ভয়ের কোন কারণ নেই, কারণ তারা এতোই ওস্তাদ, এতোই অভিজ্ঞ যে তাদের পা কখনো হড়কাবে না। কিন্তু হাজার হোক, বলা তো যায় না, তারাও তো মানুষ, তাদেরও তো দেহ আমাদেরই মতো রক্ত মাংসে গড়া।

আজকের হাঁটা পথ কালকের তুলনায় অনেক কম, মাত্র তিন কিলোমিটার, কিন্তু চড়াই এক এক জায়গায় অনেক বেশী খাড়া। প্রায় সারা পথটাই সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে চলেছি—কোথাও কোথাও গাছের গুঁড়ি দিয়ে সিঁড়ি তৈরী করা হয়েছে, কোথাও বা সিমেণ্টের সিঁড়ি। থেকে থেকেই বাঁক—হঠাৎ হঠাৎ। সমস্ত পথটাই ছায়াচ্ছন্ন, গাছের ছায়া নয়, পাহাড়ের ছায়া, অবশ্য গাছগাছালিরও অভাব নেই। গভীর খাদ দিয়ে বয়ে চলেছেন গঙ্গা, পরিসর তাঁর ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসছে। ওপারের পাহাড় সারিও অনেক কাছে। অর্থাৎ ত্বপাশে পাহাড়, মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছেন বালিকা গঙ্গা। তাঁর কলনাদ পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে গম্ গম্ শব্দ উঠছে। গঙ্গার কোলে বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই—কারো কারো মধ্যে সুদীর্ঘ ফাটল ধরেছে, কেউ কেউ বা ফেটে ফুটে চৌচির। ফাটলের ভেতর দিয়ে গল্ গল্ খল্ খল্ করে জলের ধারা প্রবল তোড়ে ছুটে চলেছে ফেনার ফুলঝুরি জ্বালাতে জ্বালাতে। এক জায়গায় জাড্ গঙ্গা এসে মিলিত হয়েছে গঙ্গার সঙ্গে—সঙ্গমস্থলের দৃশ্যটি কী সুন্দর! ত্বই গঙ্গার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এক ভীম ভয়ংকর প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড—ঠিক যেন রুদ্রমূর্তি ভীমেরই মতো। যেন আস্ফালন করে বলছে—সরে যাও, তোমাদের মিলিত হতে দেবোনা কিছুতেই। কিন্তু কে কার কথা শোনে? ত্বই গঙ্গা তার তোয়াক্কা না করেই তার নাকেরই ডগায় এসে মিশেছে একে অন্যের সঙ্গে। এই পবিত্র সঙ্গমস্থলে আশ্চর্য রকমের কতকগুলি শিলার প্রতি ডঃ কর্মকার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন—পাথরগুলিকে দেখে মনে হয় যেন গঙ্গার ফেনা দৃঢ়ীভূত হয়ে শিলায় পরিণত হয়েছে—foam stone. আরও ত্বচারটে বাঁক নেবার পর একটা সাঁকো পড়লো। তার তলা দিয়ে সোজা বয়ে চলেছে জাড্ গঙ্গা—ত্বদিকে রুক্ষ কর্কশ পাহাড়ের নিরেট প্রাচীর বরাবর চলে গেছে। কোন পাহাড়ী নদীকে একটানা এতক্ষণ ধরে এত সোজা পথে প্রবাহিত হতে এর আগে আর কখনো দেখিনি।

বন্ধুরা পেছনে আসছেন। মুন্সিরাম সামনে কোথাও অপেক্ষা করছে।

একা পথ চলতে চলতে এক জায়গায় এসে থমকে গেলাম; কী সুন্দর এই জায়গাটা! গঙ্গার মাঝখানে বিরাট এক খণ্ড পাথর। তাকে ঘিরে নীল জলস্রোত খর বেগে বয়ে চলেছে। নীল জলে ভাসছে পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা সাদা ফেনা। জলের কিনার ঘেঁষে একটি কী জানি কী গাছ—খুব লম্বা নয়, বরং বেঁটে খাটো গাঁট্টা গোট্টা, অজস্র চিকন পাতা মাথায় করে দাঁড়িয়ে আছে। গাছটা নিশ্চয়ই খুবই প্রাচীন হবে। মোটা গুঁড়িতে ফাটল ধরে সুন্দর একটি ঘরের মতো তৈরী হয়েছে। দেখে মনে হয় ওর ভেতর দিব্যি একজন আরামে বসবাস করতে পারে।

বাঁ দিকে নজর পড়তে দেখি পথের আড়ালে পাহাড়ের ফাঁকে সৃষ্টি হয়েছে একটি ছোটখাটো প্রাঙ্গনের। সেখানে মুখোমুখি ঘন হয়ে বসে আছেন তিন ব্যক্তি—পঞ্চাশ বাহান্নো বছর বয়সের এক প্রৌঢ়, পঁয়ত্রিশ সাঁইত্রিশ বছরের মধ্যবয়স্কা এক যুবতী আর আঠারো উনিশ বছরের এক নবীন যুবক। রক্ত বর্ণ বসন, গলায় আর বাহুতে রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় পুঞ্জিত জটাভার, কপালে রক্ত চন্দনের তিলক আর পাশে রাখা ত্রিশূল দেখেই বুঝতে পারলাম তাঁরা ভৈরব ভৈরবী, তন্ত্রমার্গের পথিক। তিনজনই গৌর বর্ণ সুঠাম এবং সুন্দর।

তন্ত্র সম্বন্ধে যেটুকু পড়াশুনো আছে তাতে জেনেছি স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবই তন্ত্র সাধনার প্রবর্তক এবং তিনি সর্ব সাধারণের জন্যই এই সাধন পথের নির্দেশ দিয়েছেন। তবু সব সময়ই মনে হয়েছে তন্ত্রমত এবং তন্ত্রসাধনাকে ঘিরে আছে এক দুর্ভেদ্য জটিল রহস্য—এর তত্ত্ব গভীর, সাধন নিগূঢ়। এ বিষয়ে তাই আমার বরাবরই একটি দুর্বার কৌতূহল আছে, আছে একটি দুর্নিবার আকর্ষণ। হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে এই সৌম্য সুন্দর ভৈরব ভৈরবীদের দেখা পেয়ে পতঙ্গ যেমন আগুনের দিকে ধেয়ে চলে আমার মনও তেমনি ব্যাকুল হয়ে উঠলো ওঁদের সঙ্গে মিলিত হতে। বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারছি ওঁরা যেন আমাকে এক অদৃশ্য শক্তিতে টানছেন। পথ থেকে নেমে ওঁদের কাছে গিয়ে হাজির হোলুম। বললাম—জয় তারা। ওঁরাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন—জয় তারা। ভৈরবী

মধুর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন --বাবা, কোথায় চলেছো ? সঙ্গে কেউ নেই ? বললুম—চলেছি গোমুখে, সঙ্গীরা পেছনে আসছেন। ভৈরবী বললেন—বেশ বেশ, বসো বাবা, জিরিয়ে নাও। বড়ো আনন্দ হলো তোমাকে দেখে। বললুম—মা সবাইকে দেখলেই কি আপনাব আনন্দ হয় ? প্রৌঢ় ভৈরব বললেন—সকলের মধ্যেই তারা, তাই সবাইকে দেখলেই আনন্দ হয় ; কিন্তু আনন্দের আবার একটু বিশেষ আছে যে বাবা। আত্মিক স্তরে সমভাব থাকলে আকর্ষণটা বেশী হয়, সঙ্গে সঙ্গে আনন্দও। বললুম—তাহলে তো সাধনভজনহীন সাধারণ গৃহীদের দেখলে আপনাদের বিশেষ আনন্দ পাবার কথা নয়। সাধন ভজন না থাকলে আত্মিক জীবনে কি উন্নতি সম্ভব ? ভৈরবী বললেন—সে বড়ো নিগূঢ় ব্যাপার বাবা। সাধন ভজনের পথ কি একটা ? না. জেনেশুনে না করলে সাধন ভজন হয় না ? কুঁড়ি নিঃশব্দে নিজের অজান্তেই কখন ফুল হয়ে ফুটে ওঠে সে নিজেই তার খবর রাখে না। ভারি ভালো লাগলো তাঁর কথাগুলি। বললুম—মা, আমার অনেক দিনেব অনেক প্রশ্ন জমা হয়ে আছে। ভৈরবী বললেন—হবে হবে, তোমার কথা শুনবো খন, এখন শরীরটাকে একটু চাঙ্গা করে তোলো তো আগে। এই বলে তিনি ঝুলি থেকে চারটে পাথর বাটি বের করলেন। ছুটে গিয়ে তরুণ ভৈরবটি একটা পাত্র করে ঝর্ণার জল ধরে নিয়ে এলো। ভৈরবী চারটি পাথর বাটিতে জল ভরে ঝুলি থেকে একটা রূপোর কৌটো বের করলেন। তা থেকে চারটে বড় বড় বড়ি বের করে চারটি বাটিতে ফেলে বললেন—যে যার বাটি নিয়ে আগে বড়িটা জলের সঙ্গে ভালো করে গুলে ফেল, তার পর খেয়ে নাও। যথারীতি নির্দেশ পালন করে সেই পানীয় মুখে ঢালা মাত্রই এক অপূর্ব স্বাদ আর উত্তেজনায় সারা দেহমন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। পানীয়টা যখন মুখে ঢালছিলাম তখনি দেখলাম বন্ধুরা আমাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন, কেউ আমাদের লক্ষ্য করলেন না।

কিছুক্ষণ পরে ভৈরবী বললেন—চল বাবা, এবার যাওয়া যাক। যেতে যেতে তোমার কথা শুনবো। এখানে বসে থাকলে তোমার সঙ্গীরা তোমার দেখা না পেয়ে চিন্তিত হবে। আমরা ধীরে ধীরে চলতে লাগলাম।

এক অনাস্বাদিত আনন্দ আর শক্তির উজ্জীবন অনুভব করছি নিজের মধ্যে। শীতটাও যেন অনেক কমে গেছে। বললুম—বলুন তো মা আপনাদের পরস্পরের সম্পর্কটা কী। ভৈরবী বললেন—কেন, সম্বন্ধ তো খুবই সহজ বাবা। আমি প্রকৃতি ওরা পুরুষ, আমি মা ওরা সন্তান, আমি গুরু ওরা শিষ্য। শুধু বীজমন্ত্র নয়, তত্ত্বজ্ঞান নয়, আমি ওদের তন্ত্র সাধনার প্রতিটি ক্রিয়ার আধার। বললুম—সব গুলিয়ে যাচ্ছে, দয়া করে আরও একটু বুঝিয়ে বলুন। ভৈরবী বললেন—কেন বাবা, তারাপীঠে যাওনি, আসল মূর্তিটি দেখনি? সেখানেই তো তোমার সব প্রশ্নের মীমাংসা রয়েছে। শিব তারার সম্বন্ধ কী? পুরুষ আর প্রকৃতি তো? অথচ দেখ আসল মূর্তিতে তারা জননী, শিব সন্তান। দুয়ের মধ্যে কোন ভেদ নেই বাবা। শোন—আদি শক্তি এক এবং অভিন্ন। তিনিই আদ্যাশক্তি। তাঁর থেকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। তাই তিনি নারী, জননী। তিনি পরমা প্রকৃতি, পুরুষেরও প্রসবিনী। তন্ত্র সাধনার লক্ষ্য হলো পুরুষ আর প্রকৃতি একীভূত হয়ে আদি সত্তা অর্থাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়া। প্রতিটি নারী সেই পরমা প্রকৃতিই। মাতৃভাবে নারীর সঙ্গে দেহেমনে একীভূত হবার সাধনাই তন্ত্র সাধনা। অর্থাৎ, যেভাবে প্রকৃতি থেকে পুরুষের উৎপত্তি ঘটেছে তার বিপরীত প্রক্রিয়ায় পুরুষকে বিলীন হতে হবে প্রকৃতির মধ্যে, তবেই স্বরূপের অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় একমেবাদ্বিতীয়ম্-এর উপলব্ধি হবে। এ সাধনা বড়ো কঠিন সাধনা বাবা। সহস্র প্রলোভন তুচ্ছ করে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ ও মাৎসর্যের মায়াপাশ ছিন্ন করে যেতে হয় তন্ত্রসাধককে। এজন্য দরকার প্রচণ্ড সংযমের। সিদ্ধা ভৈরবী ছাড়া আর কেউ সে পথে পুরুষকে নিয়ে যেতে পারেন না। বুঝলে?

কী বুঝলাম, কতটুকু বুঝলাম জানিনা, তবে গহন অন্ধকারের মধ্যে যেন একটা আলোর রেখা দেখতে পেলাম। অন্ততঃ এটুকু বিশ্বাস হলো যে ভৈরবী ইঙ্গিতে যে দিক নির্দেশ করলেন আরও স্থির ধীর ও গভীরভাবে সেই দিকে চিন্তাকে চালিত করতে পারলে তন্ত্রের রহস্য অর্থাৎ আদ্যাশক্তির সঙ্গে অভিন্ন হবার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব।

কথা বলতে বলতে এক সময় দেখি পথের ধারে বন্ধুরা অপেক্ষা করছেন। আমি তাঁদের সঙ্গে মিলিত হোলাম। ভৈরবী তাঁর দুই ভৈরবকে নিয়ে দ্রুত তালে এগিয়ে গেলেন, ভৈরোঁঘাটিতে কালভৈরবের দরবারে চলেছেন তাঁরা। যাবার সময় ওঁরা সমস্বরে বলে উঠলেন—জয় তারা। আমি এবং আমার বন্ধুরাও সম্মিলিত কণ্ঠে বলে উঠলাম—জয় তারা। চোখের পলকে ভৈরব-ভৈরবীর দল পথের বাঁকে উধাও হয়ে গেলেন।

মাঝে মাঝে ডাণ্ডি আসছে যাচ্ছে সওয়ার নিয়ে। বীর বিক্রমে গঙ্গা মাঈর জয়ধ্বনি দিতে দিতে ধেয়ে চলেছে ডাণ্ডি বাহকেরা। এক জায়গায় এসে দেখি ডাণ্ডি নামিয়ে বসে আছে বিশ বাইশ জোয়ান, সঙ্গে এক গেরুয়াধারী নবীন সন্ন্যাসী : কিন্তু ডাণ্ডিতে কোন মানুষ নেই, আছে একটা কাঠের বাক্স। এতগুলো জোয়ান ঐ বাক্সটা বয়ে নিয়ে যেতে হিমশিম খাচ্ছে। ওরাই বললে বাক্সের ভেতর আছে এক মর্মর মূর্তি—গঙ্গোত্রীর দণ্ডী স্বামী বিদ্যানন্দ মহারাজের। মূর্তিটি আনা হচ্ছে সুদূর জয়পুর থেকে গঙ্গোত্রীর দণ্ডী আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে। প্রচণ্ড চীৎকার করে জোয়ানেরা ডাণ্ডি তুললো, কিন্তু আবার কয়েক গজ যাবার পরই পথের ওপর ডাণ্ডি নামিয়ে বিশ্রাম নিতে বসলো তারা।

পথ ক্রমান্বয়ে অসম্ভব রকমের চড়াই হতে লাগলো। সামনে যে বাঁকটা দেখা যায় ওখানেই বুঝি বা চড়াই শেষ হয়ে উৎরাই শুরু হবে। কিন্তু না, গিয়ে দেখি ওখান থেকে শুরু হয়েছে নতুন করে আরও প্রাণান্তকর আরও ভয়ংকর আর এক চড়াই। সারা পথে উৎরাই-এর আর দেখাই পেলাম না। এক সময়ে চলার শেষ হলো। মনে হলো যেন মন্দির পথে পথে চলে এলুম এতক্ষণ। আটটায় বেরিয়ে ভৈরোঁঘাটিতে পৌঁছোলুম দশটায়, অর্থাৎ পাক্কা দুঘণ্টা সময় লেগে গেল তিন কিলোমিটার পথ আসতে—কিন্তু আশ্চর্যের কথা, মনে হচ্ছে যেন পথটা অল্পক্ষণের মধ্যেই ফুরিয়ে গেল। সুন্দরের—না না, সুন্দরতমের সান্নিধ্যে এতক্ষণ ছিলুম বলেই পথের দীর্ঘতা আর দুর্গমতা একেবারেই ঠাহর করতে পারিনি।

পাহাড়ে ঘেরা ছায়াভরা সুন্দর একটি জায়গা ভৈরোঁঘাটি। সমুদ্রপৃষ্ঠ

থেকে ২৬৫২ মিটার অর্থাৎ প্রায় ৮৭০০ ফুট উঁচু। কালভৈরবের ছোট্ট একটি মন্দির আছে। দুচারটে হোটেল। বাবা কালী কমলীওয়ালার ধর্মশালা—বহু পুরোণো বাড়ি। বনপথ দিয়ে রঙবেরঙের ঘাঘরাপরা ওড়নাদেওয়া মেয়েরা চলেছে দলে দলে, পায়ে রূপোর খাড়ু, পিঠে প্রকাণ্ড বোঝা, অনায়াস ভঙ্গিতে চলেছে তারা আলো ছায়ার উজান বেয়ে।

আমাদের এসে পড়ার বেশ কিছুক্ষণ পরে বিদ্যানন্দ মহারাজের মূর্তিটিও এসে পড়লো। তারপর সেই ভীষণ ভারি মূর্তিটিকে বাসে তুলবার জন্য সেকি প্রাণান্তকর প্রয়াস ডাণ্ডিবাহক, সন্ন্যাসী আর কণ্ডাক্টারদের। অবশেষে তাঁরা সফল হলেন। এবার যাত্রীদের নিয়ে বাস ছাড়লো। বেলা তখন প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। যাত্রা আরম্ভ হবার মুখেই যাত্রীরা সমস্বরে 'হর হর শঙ্কর' 'জয় গঙ্গা মাঈয়া কী জয়' জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলেন।

বাস ঝড়ের বেগে এঁকে বেঁকে ছুটে চলেছে সংকীর্ণ পথ ধরে। কালকের মতোই পথ, একদিকে ভয়ানক খাড়াই পাহাড় আর একদিকে সুগভীর খাদ। ড্রাইভারের এতটুকু ভুল হলেই সর্বনাশ। পাশের পাহাড় থেকে ধস নেমেছে—বিরাট বড় বড় পাথরের চাঁই নীচে গড়াতে গড়াতে ডান দিকের খাদে পড়বার আগেই মোটা মোটা গাছের গুঁড়িতে আটকে গেছে। এক জায়গায় দেখলুম পথের ওপর দিয়েই তির্ তির্ করে বয়ে চলে ঝর্ণার জলধারা।

বেলা এগারোটায় এসে পৌছোলুম গঙ্গোত্রী। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩০৫৭ মিটার অর্থাৎ প্রায় ১০০২৭ ফুট ওপরে। প্রশান্ত সুন্দর পরিবেশ —গঙ্গা বয়ে চলেছেন নৃত্যচপল ছন্দে, তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন কেদার গঙ্গা যাঁর আগমন সুদূর কেদারনাথ থেকে। গঙ্গাতীরে গঙ্গা মন্দির।

বাস থেকে নেমে এগিয়ে চলেছি, হঠাৎ কণ্ডাক্টারের চীৎকারে ফিরে আসতে হলো বাসের কাছে—বাসের ভেতর থেকে কে যেন আমাদের ডাকছে। এখানে আবার আমাদের ডাকবে কে! গিয়ে দেখি হরদয়াল শর্মা সপত্নীক উঠে বসেছেন বাসে—গঙ্গোত্রী থেকে ফিরে চলেছেন, গোমুখ আর যাওয়া হলো না। আমাদের দেখতে পেয়েই তাঁর এই সাদর আহ্বান।

কী ভালোই না লাগলো। কোথাকার কে হরদয়াল শর্মা, কতোটুকুই বা তাঁর সঙ্গে পরিচয়। কিন্তু এরই মধ্যে কী নিবিড় আত্মীয়তা গড়ে তুলেছেন তিনি আমাদের সঙ্গে। চলে যাবার সময় শেষ বিদায় নিয়ে গেলেন।

আমরা পরস্পরের আপন হই কেমন করে? আপন হবার জন্য রক্তের সম্বন্ধ, লৌকিক বন্ধন, দীর্ঘ দিনের পরিচয় কোনটাই তো অপরিহার্য নয়। তাহলে কী সেই বস্তু যা হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ সাধন করে? স্বার্থের সম্বন্ধ? কিন্তু তাও তো নয়। হরদয়াল শর্মার সঙ্গে আমাদের কিসের স্বার্থের সম্বন্ধ? উল্টে তিনিই তো একদিন আমাদের খাইয়ে দিয়েছেন। আমরা তো তাঁর জন্য কিছুই করিনি। তাছাড়া আমরাও জানি, তিনিও বেশ জানেন তাঁর সঙ্গে আমাদের আর দেখা হবার ক্ষীণমাত্রও আশা নেই, উপরন্তু তিনিও আমাদের ঠিকানা নেননি, আমরাও নিইনি তাঁর ঠিকানা, সুতরাং আমাদের মধ্যে যোগাযোগের আর কোন রকম সম্ভাবনাও থাকছে না। তাহলে? আন্তরিকতার আসল ভিত্তিটা তাহলে কী?

আমরা আশ্রয় নিয়েছি দণ্ডী স্বামী ক্ষেত্রে। শঙ্করপন্থী ঘনশ্যামানন্দ মহারাজ প্রায় পঁয়ষট্টি বছর আগে এই আশ্রমের প্রথম চারটি ঘর তৈরী করেছিলেন। এখন এই যে এতবড় তিনতলা কাঠের বাড়ি, মন্দির, মূর্তি এসবই করেছেন তাঁর শিষ্য ব্রহ্মলীন শ্রী ১০৮ দণ্ডী স্বামী ব্রহ্ম বিদ্যানন্দ তীর্থ জী মহারাজ যাঁর মূর্তি আজই এলো আমাদের সঙ্গে। বিদ্যানন্দ দেহ রক্ষা করার পর তাঁর প্রধান শিষ্য মোহন্ত শ্রী ১০৮ দণ্ডী স্বামী পূর্ণানন্দ মহারাজ আশ্রমের ভার গ্রহণ করেছেন। আশ্রমটি অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঢুকতেই দুপাশে মন্দির। মন্দিরে আছেন মহাবীর জী, গণেশ জী ও রাধাকৃষ্ণের মূর্তি, আর ঘনশ্যামানন্দ, বিদ্যানন্দ ও শঙ্করাচার্যের চিত্র। পবিত্র পরিবেশে নিঃশব্দে বিস্ময়কর নৈপুণ্যের সঙ্গে যাত্রীদের থাকার খাবার আয়োজন করে চলেছেন পূর্ণানন্দ। সব সময়ই মুখে তাঁর পরিতৃপ্তির একটি প্রশান্ত হাসি। শান্ত স্নিগ্ধ মেজাজের মানুষ, অত্যন্ত ভদ্র ও সহানুভূতিসম্পন্ন। পূর্বাশ্রম কাঠমাণ্ডু। সাতাশ বছর হলো সন্ন্যাস নিয়েছেন,

বরাবর এখানেই আছেন। গুরুর সঙ্গে থেকে তাঁর সেবা করতেন, এমন কি শীতকালে যখন রাজ্যের লোকজন সব্বাই নীচে নেমে যেত তখনও পূর্ণানন্দ থেকে যেতেন এখানে গুরু বিদ্যানন্দের সঙ্গে। পূর্ণানন্দ বললেন তাঁর প্রধান ধর্ম যাত্রীদের সেবা করা—প্রায় হাজার মতো লোকের থাকার ব্যবস্থা আছে, আর খাবার সংস্থানও হয়ে যায়, সকলের প্রয়োজন মতো উড়নি কম্বলও সরবরাহ করা হয়। এত লোক আসছে যাচ্ছে, কিন্তু কোন রকম হেঁচে নেই। সকলে একসঙ্গে বাঁধানো উঠোনে বসে দিনের বেলায় রৌদ্রে, আর রাত্রে তারাভরা নীল নিঃসীম আকাশের তলায় চাউল চাপাটি সেবন করে সামান্য সবজির সঙ্গে, কিন্তু পরম তৃপ্তির সঙ্গে খায় সকলে। খাবার শেষে যে যার বাসন ধুয়ে রাখে। এখানে সবাই মিলে মুক্ত প্রাঙ্গণে খেতে বসে তারাপীঠের কথা মনে পড়ে গেল। সেখানে মন্দির প্রাঙ্গণে মায়ের প্রসাদ—অন্ন আর মাগুর মাছের ঝোল—খেয়েছিলাম ধনী দরিদ্র ব্রাহ্মণ শূদ্র সবাই মিলে একই পংক্তিতে বসে। আমাদের সঙ্গে কয়েকটি কুকুরও ছিল, তাদেরও জন্য আলাদা পাতার ব্যবস্থা ছিল।

আজই মন্দিরে বিদ্যানন্দ মহারাজের মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করা হলো। ভারি জীবন্ত আর প্রশান্ত এই মর্মর মূর্তিটি। পূর্ণানন্দ একতলায় যেখানটায় বসেন তারই ঠিক সামনে বিদ্যানন্দকে বসানো হয়েছে—শিষ্য সব সময়ই দেখতে পাবেন গুরুকে, উদ্দীপনা আসবে কাজে, নিষ্ঠা জাগবে কর্তব্য পালনে। একান্ন বছরের সাধক পূর্ণানন্দের সঙ্গে আলাপ করে ভারি ভালো লাগলো। ভালোই বাংলা বলতে পারেন।

আমাদের জন্য দোতলায় একটা পুরো ঘর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। জুতো বাইরে রেখে ঘরের ভেতরে ঢোকা নিয়ম। সামনের বারান্দায় দুটি দোলনা ঝুলছে, লোহার শেকল দিয়ে বাঁধা চওড়া শক্ত কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরী। দোলনা আমার বড়ো প্রিয়। এতদূরে এসে এমন সুন্দর দোলনা পেয়ে একেবারে ছেলেমানুষের মতোই মেতে উঠলাম।

বেলা দুটোর সময় স্নান করতে গেলাম গঙ্গায়। গঙ্গা এখানে ক্ষীণকায়া হলেও খরস্রোতা। নারী-পুরুষের জটলা, পাণ্ডারা তর্পণ করাচ্ছে। কেউ

কেউ স্নান করছেন, কিন্তু জলে নেমে নয়। কনকনে ঠাণ্ডা জল ভীষণ তোড়ে বয়ে চলেছে—নামে কার সাধ্যি ? এপারে গঙ্গা মাঈর মন্দির—দূরে ওপারেও একটা ছোট্ট মন্দির দেখতে পাচ্ছি, কোন্ ঠাকুরের কে জানে। এপারে মন্দিরের পাশে দোকান বাজার, ওপারে সাধুমহাত্মাদের আস্তানা, যাত্রী-নিবাস, বন-আশ্রম-গৃহ।

স্নান সেরে মন্দিরে যাবো এমন সময় এক বৃদ্ধা জলের ধারে এসে কী যেন খুঁজতে লাগলেন, শেষে আমাদের বললেন তাঁর ফেলে যাওয়া লাঠিটা আমরা দেখেছি কিনা। না দেখিনি বলায় তাঁর সে কী আক্ষেপ, প্রায় কেঁদে ফেলেন আর কী। আমরা অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলুম একটা পাথরের ফাঁকে লেগে রয়েছে একটা ছোট্ট মেয়ের জামা। বুড়িকে সেটা দেখিয়ে বললুম—এটা কি তোমার কারো ? বুড়ি দৌড়ে গিয়ে সেটা তুলে নিলে, তারপর তীর্থের সম্বল পুণ্যের প্রতীক লাঠির শোক ভুলে গিয়ে জামাটি নিয়েই আনন্দিত মনে চলে গেল—ভাবটা সে ঠকেনি, জিতেই গেছে। কিন্তু সে বুঝতেই পারলো না নাক খুইয়ে নরুণ নিয়েই তাকে যেতে হলো।

আমাদের জীবনেও এই তো ঘটে চলেছে অহরহ—শ্রেয়কে ছেড়ে প্রেয় নিয়েই ভুলে আছি আমরা। যা শাশ্বত যা চিরন্তন, যাকে পেলে পাবার আর কিছুই বাকি থাকে না, তার কথা ভুলে গিয়ে যা ক্ষণস্থায়ী ক্ষয়িষ্ণু ভঙ্গুর তারই পেছনে ছুটে চলেছি। অখণ্ড সচ্চিদানন্দের বিনিময়ে ব্যাকুল হয়ে উঠেছি ক্ষণিকের আনন্দের জন্য যার নিশ্চিত পরিণাম বিষময় বিষণ্ণতা একথা জেনেও !

স্নান সেরে গেলাম গঙ্গা মাঈর মন্দিরে মাতৃ সন্দর্শনে। মন্দিরটি ছোট, কিন্তু চত্বরটি সে তুলনায় অনেক বড়, বেশ পরিষ্কার পরিপাটি। পাণ্ডাদের কোন রকম উৎপাত নেই, বরং যাত্রীদের প্রতি তাদের ঔদাসীন্য দেখে অবাক হোলাম। মায়ের মূর্তিটি ভারি সুন্দর। শ্বেত পাথরে তৈরী। সিঁথিতে সিঁদুর জ্বল জ্বল করছে। পাশে শান্তনু ভগীরথ লক্ষ্মী সরস্বতী পার্বতী যমুনা অন্নপূর্ণা ও কুবেরের বিগ্রহ।

মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়েই পাওয়া যাবে গুটি কয়েক দোকান—চা জিলিপী আলুপকৌড়ী চাউল সবজি পাওয়া যায়। দু-একটা দোকান আছে যেখানে তামা পেতলের ছোট বড় পাত্র, দেবদেবীর মূর্তি, পুঁতির মালা এই সব টুকিটাকি জিনিস-পত্তর মেলে। আরও একটু উঁচুতে বাবা কালী কমলী ওয়ালার পঞ্চায়েৎ ক্ষেত্র অর্থাৎ ধর্মশালা, পুলিস ফাঁড়ি, আর স্থানীয় লোকেদের কিছু কিছু ঘরবাড়ি—তারই পাশ দিয়ে গোমুখ যাবার রাস্তা চলে গেছে।

মন্দির থেকে ফিরে দণ্ডী স্বামীর আশ্রমের পথ ধরলুম। কিন্তু সাঁকো পেরিয়েই মনে পড়লো এপারেই তো সাধু মহাত্মাদের আস্তানা, দেখেই যাই না। কাল সকালেই তো গোমুখের পথে যাত্রা করবো, সুতরাং আজ না গেলে সাধুদের এই পুণ্য ভূমিতে হয়তো আর আসাই হবেনা। কথাটা বলেই ফেললুম বন্ধুদের। কিন্তু ওঁদের মধ্যে তেমন একটা উৎসাহ দেখা গেল না। সকলেই রীতিমত ক্লান্ত, বিশ্রামের একান্ত দরকার। আমি কিন্তু ঠিক করলুম যাবোই। গোবিন্দবাবুও শেষমেশ আমার সঙ্গে যেতে রাজী হয়ে গেলেন।

সাঁকো থেকে নেমে আমরা পাড়ে অর্থাৎ পাহাড়ে উঠতে লাগলুম। বেশ কিছুটা উঠবার পর একেবারে একটি আশ্রমের মধ্যে এসে হাজির হওয়া গেল। আমাদের সাদর আহ্বান জানালেন গেরুয়াধারিনী এক সন্ন্যাসিনী, মাথায় গেরুয়া রঙের টুপী। প্রথমেই তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন আশ্রমের মন্দিরে। ছোট হলেও মন্দিরটি সুন্দর, রাধাকৃষ্ণের নয়নলোভন একটি বিগ্রহ। এক অনির্বচনীয় স্বর্গীয় শান্তি ঘিরে রেখেছে আশ্রমটিকে। আশ্রমে থাকেন মাত্র দুজন, দুজনেই সন্ন্যাসিনী, দুজনেই বৃদ্ধা। দ্বিতীয়ার বয়েস প্রথমার চাইতে বেশী হলেও কথায় কথায় জানা গেল প্রথমাই মঠের প্রধানা। তাঁদের মূল আশ্রম বারানসীতে। প্রধানার নাম শুনে অবাক হোলাম। নাম বললেন আত্মানন্দ পুরী। আশ্চর্য হোলাম সন্ন্যাসিনীর এরকম নাম শুনে। আত্মানন্দ বললেন—সন্ন্যাসের পর নারী পুরুষে আর কোন ভেদ থাকেনা সেটা বোঝাবার জন্যই ওঁদের সম্প্রদায়ে

এরকমই নামকরণ করা হয়। আশ্রমটি ঘুরেফিরে দেখার পর আমরা আরও ওপরে উঠতে লাগলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই টের পেলাম আর এগোনো একেবারেই অসম্ভব। পথ ভীষণ চড়াই, লাঠি ছাড়া আর এক পাও এগোনো যাবেনা। অগত্যা নিরস্ত হতে হলো। খানিকটা নীচে নেমে এক টুকরো সমতল মতো জায়গা দেখে নিয়ে ওখানেই দুজনে বসে পড়লাম দুটো পাথরের ওপর ওপারের দিকে মুখ করে।

সামনের দৃশ্যাবলী ভারি ভালো লাগছে। দিনের আলো ম্লান হয়ে আসছে। ওপারের পাহাড় শ্রেণীর ওপর কে যেন ছায়ার একটা পাতলা আবরণ ধীরে ধীরে টেনে দিচ্ছে। হঠাৎ সামনের পাহাড়ের একটা অংশে চোখ পড়তে চমকে উঠলাম। পাহাড়ের ঐ জায়গাটায় গাছপালা আর প্রস্তরমালার ওপর আলোছায়ার এমন একটি আশ্চর্য বিন্যাস ঘটেছে যে মনে হয় ঠিক যেন জটাগুম্ফশ্মশ্রুযুক্ত সুবিরাট এক সন্ন্যাসী প্রবর আমাদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন, অনেকটা পাহাড়ের পটভূমিকায় দণ্ডায়মান রামদাস কাঠিয়া বাবার মতো। গোবিন্দ বাবুরও দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম সেদিকে। তিনিও বিস্মিত হোলেন কায়াহীন সেই সন্ন্যাসীর ভাবময় অস্তিত্বটি লক্ষ্য করে। সবটাই দেখার প্রমাদ সন্দেহ নেই, কিন্তু শুধু কায়াটাই কি সত্যি, ভাবটা কিছুই নয়? কায়ার কল্পনা ছাড়া কায়া কি সম্ভব? বীজের মধ্যে গাছের কায়াও থাকেনা, ছায়াও থাকেনা—থাকে বিশেষ একটি প্রবণতা, একটি 'ভাবের সম্ভাবনা', সেই ভাবটিই রূপ নিয়ে ধীরে ধীরে গাছ হয়ে ওঠে।

দণ্ডী স্বামীর আশ্রমে এসেই দেখা পেয়েছিলাম সপরিবার রাজকুমার গর্গের সঙ্গে। তারা আমাদের আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। অবাক হোলাম যখন জানলাম তার প্রায় সত্তোর বছরের বুড়ি মা গাংনানী থেকে ধাবরানী আর লঙ্কা থেকে ভৈরোঁঘাটি সমস্ত পথটাই হেঁটে এসেছেন। মনে মনে তারা মাকে স্মরণ করে বললাম—মা, তোর অমোঘ ইচ্ছেতে কী না হয়, তুই যার সহায় তার আবার ভাবনা কী বল?

গত দুদিন ডাইরী লিখতে পারিনি, কারণ লেখার মতো মানসিক অবস্থা বা পরিবেশ কোনটাই ছিলনা।

সতেরোই মে শনিবার সকাল আটটায় আমরা গঙ্গোত্রী থেকে বেরিয়ে পা বাড়ালুম গোমুখের পথে। পথের দৈর্ঘ আঠারো কিলোমিটার। এ পথ এতোই দুর্গম যে এখানে কাণ্ডি মেলেনা, ডাণ্ডি মেলেনা, ঘোড়া মেলেনা, খচ্চর মেলেনা, বেশী বোঝা নিয়েও যাওয়া চলেনা। তাই দণ্ডী স্বামীর আশ্রমে বেশীর ভাগ জিনিস পত্তর রেখে সামান্য কিছু মুন্সিরামের পিঠে চাপিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করলাম।

পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে চলেছি—ডাইনে গভীর খাদ, গঙ্গা বয়ে চলেছেন। নদীর দুপাশে বড় বড় পাথর স্তূপীকৃত হয়ে আছে, নদীগর্ভের অবস্থাও তদ্রূপ। পাহাড় সবুজ হয়ে আছে পাইন দেবদারু ফার বার্চ আর চীর গাছের জঙ্গলে। একসঙ্গে এত পাথর আর এত প্রাণ, এত সবুজ আর এত ধূসর এর আগে আর কোথাও কখনো দেখিনি।

পথ চলতে চলতে হঠাৎ বাচ্চা ছেলে মেয়ের সাড়া পেলাম পাহাড়ের ওপর থেকে। আরে, এখানে আবার বাচ্চা এলো কোত্থেকে? ওপরে তাকিয়ে দেখি পাহাড়ের মধ্যে খাসা একটি ঘরের মতো হয়ে আছে, আর সেখানে বাস করছে রীতিমত একটি পরিবার। মুন্সিরাম বললো ওখানে সপরিবারে ঘর বেঁধেছে একজন পশুপালক—"ভেড়ী বকরী কা জিম্মাদার।"

হঠাৎ দেখি সারা পাহাড় জুড়ে যেন বসন্ত নেমেছে—কচি পাতায় গাছপালা ভরে গেছে, পাখীরা গান গাইছে গাছের ডালে ডালে, গঙ্গা তুলসীর মিষ্টি গন্ধে বাতাস ভরপুর। আরও একটু পরে চোখে পড়লো ডান দিকে নদীর প্রায় কিনার ঘেঁষে এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট কয়েকটি ঝোপড়ি, এগুলি সাধু মহাত্মাদের আস্তানা, স্থানীয় ভাষায় কুটিয়া অর্থাৎ কুটীর। আগেই গঙ্গোত্রীর লোকেদের মুখে গঙ্গাদাস ফলাহারী

বাবার কথা শুনেছিলাম। তিনি একা এক নির্জন কুটিয়ায় আজ সাঁইত্রিশ বছর ধরে রয়েছেন। কুটিয়ার সংলগ্ন এক ফালি জমিতে যেটুকু আলু ওঠে তাই তাঁর খাদ্য। শীতকালে চারিদিক যখন বরফে ছেয়ে যায়, এ অঞ্চলে তখন কেউ থাকেনা, শুধু গঙ্গাদাস থেকে যান তাঁর কুটিয়ায়। এখানকার লোকেরা তাঁকে একজন উচ্চ কোটি সাধু বলে আন্তরিক শ্রদ্ধা করেন। আরও এগিয়ে গিয়ে দেখি ডান দিকে পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে একটা ক্ষীণ পদরেখা নেমে গেছে গঙ্গার দিকে প্রায় হাজার ফুট নীচে। পথের পাশে একটা ফেস্টুনে লেখা আছে—মহাত্মা গঙ্গাদাস ফলাহারী—শ্রীরাম মন্দির—অমৃতঘাট। বুঝতে পারলাম এখানেই থাকেন গঙ্গাদাস। খুব ইচ্ছে ছিল দেখে যাই তাঁকে, কিন্তু হাতে তখন আমাদের সময় ছিলনা। ভাবলাম ফিরবার সময় দেখে যাবো. ওপর থেকে চোখে পড়লো অনেক তলায় একটা গাছেব নীচে ছোট্ট একটি বাড়ি, তার গা ঘেঁষে বয়ে চলেছেন অমৃতবাহিনী গঙ্গা। সুন্দর একটি ছবির মতো!

যত এগিয়ে চলি ততই দূরে দূরে সাধুদের দু-একটি কুটিয়া চোখে পড়ে। লোকালয় থেকে বহু দূরে নির্জন পাহাড়ের কোলে কোলে কুটিয়া বেঁধে অথবা পাহাড়ের গুহায় যেসব সাধু-সন্ন্যাসী বসবাস করছেন তাঁরা নিশ্চয়ই সাধারণ নন। মানুষ সামাজিক জীব। মানুষের সঙ্গ না পেলে সে হাঁপিয়ে ওঠে। রাজৈশ্বর্যের মধ্যেও যদি কোন নির্জন দ্বীপে আমাদের রাখা হয় তবু নিঃসঙ্গতার দুর্বিষহ অনুভূতিতে আমাদের মন ভরে উঠবে আলেকজাণ্ডার সেলকার্কের মতোই আমরাও বলে উঠবো—ওহো, আমাব যদি কবুতরের মতো একজোড়া ডানা থাকতো তাহলে এক্ষুণি এই মুহূর্তেই উড়ে চলে যেতাম আমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের মধ্যিখানে। বন্ধুপ্রীতি আমাদের এমনই প্রবল যে দিনের মধ্যে অন্ততঃ একটিবারের তরেও তাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য আমরা ছটফট করি। একথাটা অবশ্যই ঠিক যে কখনো কখনো মানুষের ভিড় আমাদের ভালো লাগেনা, তাই বেরিয়ে পড়ি নিরালা নির্জন কোন জায়গার উদ্দেশে। কিন্তু বেশী দিন সে নির্জনতাও আর ভালো লাগেনা, আবার ফিরে আসি জনারণ্যের মাঝখানে। তাছাড়া

হলো এগিয়ে যেতে, সে যেন লালবাবার ভূজবাসার আশ্রমে আগেভাগে পৌঁছে গিয়ে আমাদের জন্য খাবার ব্যবস্থা করে রাখে, কারণ আমরা যে গতিতে এগোচ্ছি তাতে করে ভূজবাসা পৌঁছোতে রীতিমত দেরী হবারই কথা।

আমিও এগিয়ে চলেছি। ভাবছি বন্ধুরা এই বুঝি এসে পড়লেন। কিন্তু ফিরে দেখি—না, তাঁদের মধ্যে নড়াচড়ার কোনও রকম লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। দাঁড়িয়ে পড়লাম তাঁদের অপেক্ষায়। বেশ কিছুক্ষণ পরে গোবিন্দবাবু কাছাকাছি এলে জানা গেল দেরী হবার কারণ শ্রীদাসজী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাই ডঃ কর্মকার তাঁকে কিছু ওষুধপত্র দিচ্ছেন।

এমনিভাবেই মা তারা তাঁর সন্তানদের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন। অসুখ বিসুখে আমার হাত দিয়ে তোমার সেবা করেন, তোমার হাত দিয়ে আমার। ঠিক এই মুহূর্তে শ্রীদাসজীর ওষুধের দরকার ছিল, তাই তিনি ডঃ কর্মকারের হাত দিয়ে শ্রীদাসজীর মুখে ওষুধ তুলে দিচ্ছেন। কিন্তু আমাদের যখন তিনি বিপদে ফেলেন, শোকদুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা হতাশা ব্যর্থতায় জর্জরিত করেন, অসম্মানে অপমানে বিধ্বস্ত করে ফেলেন তখনো কি আমাদের প্রয়োজন মেটাবার জন্যই তিনি তা করে থাকেন? আমরা কেউ কিন্তু তা বিশ্বাস করিনা, বিশ্বাস করতে চাই না। উল্টে এরকম অবস্থায় পড়লে তাঁকে আর করুণাময়ী বলে ভাবতে আমাদের মন সায় দেয় না, অনেক সময় নিষ্ঠুরতার অভিযোগ আনি তাঁর বিরুদ্ধে। কিন্তু এই সহজ কথাটা কেন আমরা বুঝতে পারিনা যে ভালোর যদি দরকার থাকে, তাহলে মন্দেরও দরকার আছে। আমার যদি যৌবনের প্রয়োজন থাকে তাহলে বার্ধক্যেরও প্রয়োজন নিশ্চয়ই থাকবে, স্বাস্থ্যের প্রয়োজন থাকলে ব্যাধিরও প্রয়োজন থাকতেই হবে, জীবনের প্রয়োজন মৃত্যুর প্রয়োজনকেই তো সমর্থন করছে। একটাকে বাদ দিলে যে আর একটার কোন অর্থই হয় না, এককে বাদ দিয়ে অন্যের কোন সার্থকতা থাকতেই পারে না যে। তাছাড়া ধাতুকে মজবুত করতে হলে, নানান রূপে ছান্দত করতে হলে যেমন তাকে তাপে গলাতে হয়, হাতুড়ি দিয়ে পিটোতে হয়, ঠিক তেমনি নশ্বর

বস্তুর প্রতি আমাদের আসক্তি নাশ করে, যা চিরন্তন যা শাশ্বত, যা একাধারে সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ আমাদের সমগ্র চেতনায় তাঁকে উদ্ভাসিত করে তুলবার, আমাদের সমস্ত অহংকারকে চূর্ণ করে সর্বতোভাবে আমাদের চৈতন্যকে তন্মুখী করার জন্য আমাদের ওপর নির্মম আঘাত হানা যে নিতান্তই দরকার। সাধক কবি তাই না বলেছেন—জানি তুমি মোরে করিবে অমল যতই অনলে দহিবে।

এতক্ষণ পথ মোটামুটি ভালোই ছিল, কিন্তু এরপর থেকে তার চেহারা একেবারেই বদলে গেল। চড়াই ক্রমশ খাড়া এবং সংকীর্ণ হয়ে আসছে, পথ অতীব দুর্গম, কোন কোন জায়গায় মাত্র এক হাত কী বড় জোর দেড় হাত প্রশস্ত। পাশের পাইনের বনে বাতাস লেগে মনে হচ্ছে কারা যেন ফিস্ ফিস্ করে কথা কইছে ফিসফিসানি শুনে থেকে থেকে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। একপাশে পাহাড় থেকে মাঝে মাঝে পাথর পড়ছে গড়িয়ে প্রবলবেগে, অন্য পাশে অন্তহীন মৃত্যুখাদ হাঁ করে আছে গিলে খাবার জন্য। রাস্তার বালি পায়ের চাপে ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ছে। পা লেগে পায়ের তলার পাথর উঠছে ভীষণ ভাবে কেঁপে, টাল সামলানো প্রায় অসাধ্য হয়ে উঠছে। তার ওপর হঠাৎ হঠাৎ ঠাণ্ডা দমকা বাতাস এসে আচমকা ঠেলা মারছে প্রচণ্ড জোরে। ঢালের দিকে চোখ পড়লে মনে হয় এই বুঝি মাথা ঘুরে পড়েই গেলাম। প্রাণটিকে হাতের মুঠোয় ভরে কোনো রকমে পথ হাঁটছি। কোনো পাশে তাকাবারও সাহস পাচ্ছি না, আপ্রাণ চেষ্টা করছি কেবলমাত্র সামনের যে জায়গাটায় পা ফেলবো শুধু সেইখানে সমস্ত মনটাকে নিবদ্ধ রাখতে। অবিরাম নীচের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ঘাড় ব্যথা করছে। চলতে চলতে পাও আসছে অবশ হয়ে মনে হচ্ছে কেন এসেছিলুম এই দুর্গম পথে, এতটা দুঃসাহস কি ভালো? পথের দুর্গমতম অংশগুলো পেরিয়ে আসবার ঠিক পরেই মনকে প্রশ্ন করছি—ভাগ্যবলে পেরিয়ে তো এলুম, কিন্তু ফিরতি পথে এইসব জায়গা আবার নির্বিঘ্নে পাড়ি দিতে পারবো তো, না এদেরই কোন এক স্থানে এই দুঃসাহসের সমুচিত উত্তর পেয়ে যাবো চিরদিনের মতো?

এক জায়গায় সামনে চোখ পড়তে দেখি—আরে, এ যে দেখছি সেই ভদ্রমহিলা, সেই আধুনিকা বিবিজান যিনি স্বামী আর স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে হৃষীকেশ থেকে একই বাসে আসছিলেন আমাদের সহযাত্রিনী হয়ে, এখন গঙ্গোত্রীর দিকে ফিরে চলেছেন দেখছি। কিন্তু কোথায় গেল সেই হাসি-খুশিভরা উদ্দাম উচ্ছলতা, সেই বেপরোয়া বেমানান গিন্নিপনা? ভয়ে আর ক্লান্তিতে মুখটি একেবারে বিবর্ণ ফ্যাকাশে এতটুকু হয়ে গেছে, বেশবাসে কোনরকম পারিপাট্য নেই—ভাবটা হে ঈশ্বর এ যাত্রার মতো বাঁচিয়ে দাও, আর কক্ষণো ভুলেও এদিক মাড়াবো না। তাঁর পেছনে পেছনে অনতিদূরে দেখছি স্বামীর বন্ধুটি আসছেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে। বন্ধুটির কাছে শুনলাম স্বামী ভদ্রলোক অসুস্থ হয়ে গঙ্গোত্রীতেই থেকে গেছেন, গোমুখ পর্যন্ত তাঁরাও যেতে পারেননি, মাঝপথ থেকে ফিরে চলেছেন। মনে মনে বললাম—মা গঙ্গা, তুমি কারো কোন গর্বই রাখোনা, তুমি শুধু শুভদা সুখদা নও মা, তুমি দর্পহারিণীও। ধন্য তুমি।

মুন্সিরাম কোন্ কালে চলে গেছে চোখের বাইরে। পথ এখনো অনেক বাকি। যে রকম পায়ে পায়ে আমরা হাঁটছি সেভাবে চললে লালবাবার আশ্রমে পৌঁছোতে আমাদের নির্ঘাৎ রাত হয়ে যাবে, অথচ সঙ্গে আছে একটি মাত্র টর্চ। আর একটা মুন্সিরামের কাছে থেকে গেছে। পথ ক্রমান্বয়ে খারাপ হচ্ছে দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। ঠিক হলো গোবিন্দবাবু আর আমি যাবো এগিয়ে, তারপর ভূজবাসা থেকে দুটো টর্চ সহ মুন্সিরামকে পাঠিয়ে দেবো ডঃ কর্মকার আর ডঃ চৌধুরীকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্য।

সিদ্ধান্ত মতো এগিয়ে চললাম। বহু বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে, কখনো প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে, কখনো পড়তে পড়তে কোনক্রমে টাল সামলে নিয়ে, কখনো বা গড়িয়ে আসা প্রস্তর খণ্ডকে এড়িয়ে যাবার উদ্দেশ্যে প্রায় দৌড়োতে দৌড়োতেই চলতে লাগলাম। তবু এক টুকরো ছিটকে আসা পাথরের ঘায়ে গোবিন্দবাবুর মাথা সামান্য একটু কেটে গেল।

এবারে আর এক নতুন উপসর্গ দেখা দিল। পাহাড়ের মাথায় জমাট বাঁধা বরফের ওপর সূর্যের কিরণ পড়ে একটা ঝাঁঝালো আলোর সৃষ্টি

হয়েছে। সেদিকে তাকালেই চোখ যেন ঝলসে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি চশমার সঙ্গে সানগ্লাসটা লাগিয়ে নিলাম। তাতে করে সমস্যার কিছুটা সমাধান হলো বটে, কিন্তু পুরোপুরি হলোনা। তবে ধীরে ধীরে সমস্ত ব্যাপারটা গা-সওয়া হয়ে উঠলো, তাছাড়া দিন ফুরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আলোর ঝাঁঝটাও একটু একটু করে কমতে লাগলো।

এক সময় পথে দেখা হলো তুজন জওয়ানের সঙ্গে। তাদের একজন বিদেশী। তারা বললে সামনে চীরবাসায় তারা তাঁবু ফেলেছে। একদল গেছে গোমুখের পথে, আর ওরা চলেছে তপোবনের দিকে—তপোবনে একটা পাহাড়ের চূড়োয় বরফ জমে এক প্রাকৃতিক শিবলিঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে। আরও কিছুদূর চলার পর চীরবাসা পৌঁছোলুম। অজস্র চীরগাছের ঘন বনচ্ছায়ায় সুন্দর একটি বিশ্রাম স্থল। বড় বড় পাথরে বসে ভারি সুখ, চীরগাছের বাতাস সমস্ত ক্লান্তি জুড়িয়ে দেয় এক নিমেষে। এইখানে দেখা হলো পুনে মাউন্টেনিয়ারীং ইনস্টিটিউটের একদল পর্বতাভি-যাত্রীর সঙ্গে। সকলেই তরুণ। দলে একটি মেয়েও আছে। সুগঠিত দেহ, কুড়ি বাইশ বছর বয়েস হবে। বিরাট এক বোঝা পিঠে ফেলে সাবলীল গতিতে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে সে। তরুণ দলনেতা আমাদের শুভেচ্ছা জানালে। এরাই ভারতের গৌরব, এই তুঃসাহসীর দল। গর্বে আমাদের বুক ভরে উঠলো।

চীর গাছের ঘন বনচ্ছায়ে একদল তরুণ সন্ন্যাসীর সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল। তাদের মধ্যে একটি মহারাষ্ট্রের সন্তান। কী সুন্দর দেখতে, কেমন প্রশান্ত মুখচ্ছবিটি, ঢুলু ঢুলু টানা টানা চোখতুটি, মধুমাখা কথাগুলি, ধীরে ধীরে কথা বলে। আর ছিল একটি বাঙালী তরুণ। বাঁকুড়ায় বাড়ি ছিল, মালিয়াড়া গ্রামে। পদবী ছিল দে, নামটি কী বলেছিল আমার মনে নেই। এগারো বছর বয়েসে ঘর ছেড়েছে। যখন বয়েস পাঁচ-ছ বছর তখন মা মারা গেলেন। বছর ঘুরতেই বাবা আবার বিয়ে করলেন। বাবা ওকে ভালোবাসতেন খুবই, কিন্তু সৎ মা তু-চোখে দেখতে পারতো না। পদে পদে দূর ছাই করতো, গোরু গাধার মতো খাটাতো,

প্রতি কাজে খুঁত ধরতো, অকথ্য গালাগালি দিত, নির্মমভাবে মারধোর করতো, আর তার নামে বাবার কানে ভূরি ভূরি মিথ্যে অভিযোগ তুলে তার বিরুদ্ধে তাঁর মনটাকে বিষিয়ে তুলতে কসুর করতো না। যখন সং-মায়ের নিজের ছেলেপুলে হলো তখন থেকে এসবের মাত্রা ক্রমে ক্রমেই বেড়ে চললো। বাবা প্রথম প্রথম সং মায়ের কথায় কান দিতেন না, কিন্তু ধীরে ধীরে তিনিও বদলে যেতে লাগলেন। আগে পরামর্শ উপদেশ, তারপর মৃদু তিরস্কার আর গঞ্জনা, তারও পরে মারধোর শুরু করলেন। অবশেষে একদিন সন্ধ্যেবেলা সং মায়ের প্ররোচনায় খাবার থালা থেকে তুলে এনে ঘাড় ধরে বাবা তাকে দূর করে দিলেন বাড়ি থেকে। সেই মুহূর্তে মায়ের কথা খুব বেশী করেই তার মনে পড়েছিল, সমস্ত অন্তর উপচে বেরিয়ে এসেছিল দুকূল ভাঙা আকুল কান্না। ঘর থেকে বেরিয়েই সে ঘরসংসার ছেড়ে গ্রাম ছেড়ে চিরকালের মতো পা বাড়ালো পথে। চলতে চলতে ভিড়ে গেল এক সাধুর দলে। তারপর এদল থেকে সে দল, সে দল থেকে ও দল! এমনি করে সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সঙ্গে দেশ দেশান্তে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে হিমালয়ের রাজ্যে এসে পড়েছে। ওদের দলের সকলেই এই ধরনের কোন না কোন কষ্ট বুকে নিয়ে ঘর ছেড়েছিল। প্রশ্নের উত্তরে সকলেই বললে—ওদের প্রাণের সমস্ত জ্বালা জুড়িয়েছে, ওরা শান্তি পেয়েছে, কারো বিরুদ্ধে আর কোন অভিযোগ নেই ওদের মনে।

চীরবাসা ছাড়িয়ে আসবার কিছুক্ষণ পর থেকেই শুরু হলো ভূর্জ গাছের বন। ভূর্জ গাছে গাছে পাহাড় ছেয়ে আছে, কিন্তু প্রায় কোন গাছেই পাতা নেই। সাদা সাদা কাণ্ড নিয়ে ছোট ছোট পত্রহীন গাছগুলো বর্ষার জন্য অপেক্ষা করে আছে। যখন বর্ষা নামবে দু-এক মাসের মধ্যে, তখন সবুজ পাতার সম্ভারে তারা শ্যামল হয়ে উঠবে।

আশা নিয়েই তো আমরা সবাই বেঁচে আছি। আশা আছে, তাই তো কাজের প্রেরণাও আছে। ভালো ফসলের আশায় কৃষক জমি চষে, ছাত্র লেখাপড়ায় মন দেয় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কল্পনা করে, সন্ন্যাসী কৃচ্ছ্র সাধন করেন মহত্তমকে লাভ করার আকাঙ্ক্ষায়। আশা আছে বলেই বর্তমানের

ভেতর দিয়ে আমরা তিলে তিলে আমাদের বাঞ্ছিত ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলি, যেমন করে পত্রোদ্গমের গোপন প্রস্তুতি চলেছে ভূর্জগাছগুলির অন্তরের অন্তস্তলে এখন থেকেই, অপেক্ষা শুধ্ বর্ষণের। আমাদেরও কাজ সেই মহত্তমের আবির্ভাবের জন্য মনকে প্রস্তুত করে রাখা, তিনি এসে পড়লে তৈরী নই বলে তাঁকে যেন ফিরিয়ে না দিই। শবরীর মতো প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুত হয়ে প্রতীক্ষা করে থাকতে হবে তাঁর জন্য, তাহলে না এসে তিনি পারবেন না। আর যদি নাই আসেন তাতেই বা কী? তিনি আসবেন এই সুখ স্বপ্নেই তো বিভোর হয়ে থাকবো, আনন্দের কল্পনা সেও তো আনন্দ। চার্লস্ ডিকেন্সের আঁকা চরিত্র মিঃ মিকবারের দুঃখ দারিদ্র্যের সীমা পরিসীমা ছিলনা, কিন্তু তিনি রীতিমত সুখেই ছিলেন এই ভেবে যে—Something may turn up, ভালো একটা কিছু যে কোন সময়েই ঘটে যেতে পারে।

একটা ভূজগাছের গুঁড়ি থেকে খানিকটা ছাল সংগ্রহ করলুম—দিব্যি কাগজের মতো, ডট্ কলম দিয়ে বেশ কিছুটা লিখেও ফেললুম তার ওপর। চীরবাসা ছাড়িয়ে আসবার পর একটা জায়গায় এসে মহা বিপদে পড়া গেল—একটা পথ গেছে সোজা এগিয়ে, আর একটা নেমে গেছে নীচের দিকে। এখন কোন্ পথ দিয়ে যাই। নীচের দিকে যেটা নেমে গেছে তার শেষে দেখা যাচ্ছে একটা বাড়ি। তাহলে ওটাই কি ভূজবাসা! কে বলে দেবে? বিভ্রান্ত হয়ে ইতস্ততঃ করছি ঠিক এমন সময় একদল স্থানীয় লোক কোথা থেকে হঠাৎ এসে আমাদের সকল মুস্কিলের আসান করে দিলে। ওরা বললে—সোজা এগিয়ে যাও, নীচে পথ প্রান্তে যে বাড়িটা দেখছো ওটা ভূজবাসা নয়, চীরবাসা যা কিছুক্ষণ আগেই তোমরা ফেলে এসেছো। লোকগুলো একথা বলেই কিন্তু চোখের পলকে কুয়াশার অন্ধকারে হন্ হন্ করে কোথা দিয়ে কোথায় যে চলে গেল ঠাহরই করতে পারলাম না।

বেলা সাড়ে চারটে নাগাদ এসে পড়লাম ভূজবাসায় লালবাবার আশ্রমে। পথে মুন্সিরামের সঙ্গে দেখা, সে ফিরে যাচ্ছে ডঃ কর্মকারদের

নিয়ে আসতে। চারিদিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা পটলাকৃতি একটি উপত্যকায় লালবাবার আশ্রম। লাল পতাকা উড়ছে আশ্রমের সীমানায়। বুনো ঝোপঝাপ কেটে তাই স্তূপাকারে সাজিয়ে সাজিয়ে আশ্রমের বেড়া তৈরী হয়েছে। রাস্তা থেকে শ'দুয়েক ফুট নেমে যেতে হয় লালবাবার আশ্রমে। রাস্তার যেখান দিয়ে নেমে আশ্রমে যেতে হয় সেখানে দুপাশে খুঁটিতে টাঙানো একখণ্ড কাপড়ে লেখা আছে বাবা লালবিহারী দাসজী (লাল বাবা) --ভূজবাসা আশ্রম। আশ্রমটি দেখে দেহে নতুন করে প্রাণের সঞ্চার হলো। বেলা সাড়ে চারটে বেজে গেছে—এই সুদীর্ঘ ক্লেশকর বিপদসংকুল পথ অতিক্রম করে এসে দেহমন সম্পূর্ণ অবশ হয়ে পড়েছে, শ্বাস নিতে ভীষণ কষ্টবোধ করছি, সারা শরীরে ব্যথা, পা টলছে, মাথা ঘুরছে। কোনক্রমে প্রায় বেহুঁশ অবস্থায় লাঠিতে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পায়ে পায়ে আশ্রমে এসে হাজির হোলাম। এসে পড়তেই সে কি সাদর সম্বর্ধনা!

কাঠের বাড়ি—জানালাবিহীন, ছয় কামরা, তিনটি যাত্রীদের জন্য, একটিতে বাবা শিষ্যদের নিয়ে থাকেন, একটি ভাঁড়ার ঘর—প্রচণ্ড শীত পড়লে রান্নাও করা হয় সেখানে, একটিতে পাতনি আর কম্বল রাখা আছে। বেশ বড় ধরনের একটা আটচালার একপ্রান্তে রামজীর মন্দির। মন্দিরে রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন সীতা ও মহাবীরজী ছাড়াও নারায়ণ শিলা আছেন, আর আছেন মহাদেও। লালবাবার গুরু বিষ্ণুদাসজীর ফটোও আছে দুটি। একটিতে তুষারাবৃত হিমালয়ের কোলে অনাবৃতদেহ কৌপীনধারী সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছেন, অন্যটিতে একই পরিবেশে গুরুর পা জড়িয়ে আছেন লালবাবা। আটচালার অন্য পাশে মেঝে খুঁড়ে তৈরী হয়েছে বিরাট একটা চৌবাচ্চা। তার মধ্যে ভূজকাঠের অনির্বাণ ধুনি জ্বলছে--সেইখানেই রান্নাবান্না, চা তৈরী, জল গরম সবই হচ্ছে। শিষ্য সন্ন্যাসীর দল এই সব কাজ করছেন, তাঁদের ঘিরে আগত যাত্রীরাও আগুন পোহাচ্ছেন চা খেতে খেতে। জমিতে আলু লাগানো হয়েছে। আশ্রমের মধ্যেই একপাশে ঝর্ণা থেকে অবিরাম জল ঝরে পড়ছে। সেই জল দিয়ে সেচেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। চারিদিকের পাহাড় বরফে ছাওয়া। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস

লেগে সমস্ত শরীর হিম হয়ে আসছে, ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছি। আশ্রমে পৌঁছোতেই বাবা বললেন—আগুনের পাশে বসে চা খেয়ে নাও, তারপর ঘরের ভেতর ঢুকে পড়। তাই করলুম। অবাক হোলুম বাবার কাণ্ড-কারখানা দেখে। সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা। খালি গায়ে মাত্র একখানা নামাবলি জড়ানো। হাঁটু পর্যন্ত এক টুকরো কাপড় পরা। দুপায়ে মোজা। জুতোর বালাই নেই। মাথায় পাগড়ি। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। মহানন্দে বুঁদ হয়ে আছেন। এক মুহূর্তও বসে নেই। একাই চেঁচামেচি হৈ হল্লা করে সারা আবহাওয়াটা সরগরম করে রেখেছেন। প্রায়ই হাত মেলাচ্ছেন শিষ্যদের সঙ্গে—শুধু হুকুম করা নয়, সমান তালে সবার সঙ্গে কাজও করে চলেছেন। মনে পড়ে গেল সেই সব কথাগুলি—আপনি আচরি ধর্ম পরে শিখাইবা, বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে।

ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি ইতিপূর্বে আরও কয়েকজন এসে গেছেন। থাকার ব্যবস্থাও অপরূপ। মেঝেতে মোটা সতরঞ্চি পাতা—মেঝে সমতল নয়, ঢেউ খেলানো। আলুর ক্ষেতে যেমন সারি সারি আল থাকে ঘরের মেঝেও তেমনি। দুটি আলের মাঝখানের খাঁজটি একজনের জন্য বরাদ্দ। আমরা যে ঘরে ঢুকলুম তাতে এরকম পনেরোটি খাঁজ আছে, অর্থাৎ পনেরো জন যাত্রী একসঙ্গে এই ঘরে শুতে পারবেন পর্যায়ক্রমে এদিক ওদিক মাথা করে। বাবা কাঁথা কম্বল দেন, তাই বিছানাপত্র আনা হয়নি, বেশী কিছু নিয়ে আসবার উপায়ও ছিল না। আনলেও কোন কাজে লাগতো না, এক হাতেরও কম পরিসর জায়গা নিয়ে কীই বা করতাম। বাবা যা বিছানাপত্র দেবেন দিয়ে দিলেই তো পারেন। একটু শুয়ে পড়ি তাহলে। কিন্তু না, খাবার আগে বাবা কিছুতেই বিছানা দেবেন না। সুতরাং সেই ঠাণ্ডা সতরঞ্চির ওপরই গা এলিয়ে দিলাম। ধীরে ধীরে ঘর ভরে গেল। এখন বুঝতে পারলাম বাবা যদি এভাবে যাত্রীদের শোবার ব্যবস্থা না করতেন তাহলে দুরন্ত শীতে এতগুলি মানুষকে আশ্রয় জোগাতেন কেমন করে? মাথা নীচু করে ঘরে ঢুকতে হয়। ঘরে ঢুকেই কাঠের দরজা বন্ধ না করলে কনকনে বাতাস লেগে সবাই জমাট বেঁধে

যাবে। ডঃ কর্মকার ও ডঃ চৌধুরী যখন এসে পড়লেন তখন রাত্তির আটটা।

ঘরের মধ্যে সকলে পাশাপাশি রয়েছি। এক কোণায় টিম টিম করে একটা মোমবাতি জ্বলছে। ওপাশে একটা কেরোসিনের কুপিও রয়েছে দেখছি।

রাত্তির ন'টা নাগাদ বাবা ঢুকলেন ঘরে—চেঁচিয়ে মেচিয়ে পাড়া মাৎ করে সবাইকে তুলে বসালেন। তাঁর হাতে চাপাটির ঝুড়ি। সঙ্গে শিষ্যবর্গ আর গাঙ্গুলীদা, অর্থাৎ প্রদ্যোৎ কুমার ওরফে ঝণ্টু গাঙ্গুলী। গাঙ্গুলীদা থাকেন খড়্গপুরে, আই-আই-টিতে অধ্যাপনা করেন, ফি বছর এই সময় ভূজবাসায় আসেন বাবার সঙ্গে যাত্রীদের সেবা করতে। ভারি নম্র আর সেবাপরায়ণ। সবাইর সামনে একটি করে টিনের থালা আর গ্লাস বসিয়ে দেওয়া হলো। তারপর বাবা চাপাটি পরিবেশন করে চললেন। সবজি মানে শুধু ডাল। হাস্যময় বাবা তাঁর সরস মন্তব্যে সবাইকে মাতিয়ে রাখলেন। এক এক হাতা সবজি দিচ্ছেন আর বলছেন—এই নাও মাছের ঝোল, মাংসের কোরমা, আলুকপির দম। প্রেমসে খাও, পেট ভরে খেয়ে নাও। কারো কোন ওজর শুনছেন না, জোর করে চাপাটি আর সবজি চাপিয়ে চলেছেন। ফেলে রাখার উপায় নেই, খেতেই হবে। কী আদর, কী শাসন! বাবার মুখের ওপর কারো কথা বলার জো'টি নেই। সবাই মাথা পেতে তাঁর স্নেহের শাসন সানন্দে মেনে নিচ্ছেন। খাওয়া দাওয়ার পর গরম জলে মুখ ধুয়ে নাও। তারপর নিজের নিজের থালা বাসন গরম জলে ধুয়ে যথাস্থানে রেখে এসো। আহার সমাপ্ত হবার পর ডাক পড়লো বিছানা নিয়ে আসার। বাবা বসে আছেন ঝুপড়ীর মুখে। ভেতর থেকে একজন পাতনি কম্বল জুগিয়ে যাচ্ছে তাঁকে, তিনি সেগুলি তুলে দিচ্ছেন যাত্রীদের হাতে একেক জন করে। প্রত্যেককে একখানা মোটা পাতনি আর দু'টো করে কম্বল দেওয়া হচ্ছে। বিছানা পেতে শুয়ে পড়লুম। বাইরে প্রচণ্ড ঝড় বইছে, তার সোঁ সোঁ গর্জন শুনতে পাচ্ছি।

ঘুম ভাঙলো ভোরবেলা। খুব যে ভালো ঘুম হয়েছিল তা নয়। মাঝে

মাঝে ঘুম ভেঙেছে, আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। এবারে ঘুমটা ভেঙে গেল পাশের কামরায় দুই যুবকের উত্তেজিত কথা কাটাকাটিতে। সামান্য ব্যাপার নিয়ে দুজনেব মধ্যে এই সাত সকালে তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা বেধে গেছে। সঙ্গে কী একটা জিনিস আনবার কথা ছিল, আনা হয়নি। এই তুচ্ছ ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করে দুজনের মধ্যে প্রায় হাতাহাতি হবার উপক্রম। আর পাঁচ জনের মধ্যস্থতায় ধীরে ধীরে তারা শান্ত হলো বটে, কিন্তু কেউ কেউ মজা দেখবার জন্য মাঝে মাঝে টিপ্পনী কাটছিলেন, আর অমনি তাদের মনের স্তিমিত ক্রোধাগ্নি আবার ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠছিল। আশ্চর্য লাগলো এখানে এসেও ওরা পারছে না কেন নিজেদের সংযত করতে একথা চিন্তা করে। যদি গৃহের আরামই চাইবে তাহলে এই দুর্গম পথে আসা কেন? পরস্পরকে যদি ভালোবাসতে নাই পারবে, যদি ধৈর্য ধরে কষ্ট সইতে না পারবে, যদি এই বিদেশ বিভুঁই-এ নিজের মতো অন্যের প্রয়োজনের কথা ভেবে কিছুটা স্বার্থ ত্যাগ করে তাকে মেনে নিতে না পারবে তাহলে তীর্থপথের সহযাত্রী হতে গেলে কেন? কিন্তু বলে কী লাভ? যে যেমন সে তেমন। তুমি চলবে তোমার মতন, আমি চলবো আমার মতন। সকল ভাবেরই তো ভাবুক সেই একজনই—তাঁরই ওপর সকল ভাবনার দায় চাপিয়ে দিয়ে আমি কেন না হাল্কা রাখি নিজেকে? দরকার কী আমার অতশত চিন্তা করার?

একটু পরেই গেলাস আর চায়ের কেটলী নিয়ে ঘরে ঢুকলেন বাবার এক চেলা। সবাইকে তুলে দিয়ে প্রত্যেকের হাতে গেলাসভরা গরম চা ধরিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন তিনি। তাঁরও ধরণ-ধারণ, বচন-বাচন অনেকটাই লালবাবারই মতো, অর্থাৎ গুরুর প্রভাবটি তাঁর ওপর পড়েছে প্রচণ্ডভাবে। চা খেয়ে শরীরটা চাঙ্গা হয়ে উঠলো। তারপর ধীরে ধীরে তৈরী হয়ে পা বাড়ালাম গোমুখের দিকে।

যতই এগোই পথ ততই দুর্গম হতে থাকে। যেদিকে চোখ পড়ে, শু[illegible] বরফাবৃত পাহাড়। এক জায়গায় দেখি একটা বিরাট পাহাড়ে ফাটল ধরেছে। প্রায় হাজার ফুট উঁচু থেকে সেই ফাটল বেয়ে

আসছে উদ্দাম এক ঝর্ণা। ফাটলের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে এক ফালি নীল আকাশ। সেখানে চক্রাকারে উড়ে বেড়াচ্ছে এক ঝাঁক পাখি। মাঝে মাঝে ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে পথের ওপর দিয়ে। কোনো কোনো জায়গায় জল জমে বরফ হয়ে আছে। এক এক স্থানে চলার রাস্তা শেষ হয়ে শুরু হয়েছে পাথরের রাজ্য। রাশি রাশি হবেক রকমের হরেক আকারের শিলাখণ্ড একটার গায়ে আর একটা গা ঠেকিয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে। সেই সব পাথরের এক একটা ছোটখাটো টিলার মতো। সামনে যে চলেছে দেখছি দু'মিনিট পরে আর তাকে দেখতেই পাচ্ছি না—কোন টিলার আড়ালে সে পড়ে গেছে কে জানে। যে পাশে তাকাও সেটাকেই তোমার পথ বলে মনে হবে, তার সবকটাই কিন্তু পথ নয় এবং কোনটাই সুগম নয়। প্রায়ই পা পড়লে পাথর উঠবে প্রচণ্ডভাবে নড়ে, দৃঢ়ভাবে পা রেখে দাঁড়ানোই দায় হয়ে পড়বে তখন। পথ-প্রদর্শক না থাকলে এরকম জায়গায় দিক হারিয়ে ফেলা একরকম অবধারিত। মন্সিরাম না থাকলে আমরা এপথ চিনে কখনোই আসতে পারতাম না।

এমনি করে চলতে চলতে হঠাৎ এক সময় মন্সিরাম সোল্লাসে চীৎকার করে উঠলো—ঐ যে গোমুখ দেখা যাচ্ছে, ঐ ঐ। দ্রুতপদে এগিয়ে যাই। হঠাৎ চেয়ে দেখি এক আশ্চর্য স্বর্গীয় দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে! বিরাট এক হিমবাহ, বরফ গলে গলে তার সর্বাঙ্গে অজস্র খাঁজের সৃষ্টি হয়েছে। খাঁজগুলি যেমন দীঘল, তেমনি গভীর। ওপরে নির্মল নীল আকাশ। সূর্যের আলোয় চারিদিক ঝলমল করছে। উজ্জ্বল আলো পড়ে হিমবাহ থেকে ঠিকরে পড়ছে বিচিত্র এক বর্ণচ্ছটা। তলদেশে বরফ গলে জন্ম নিয়েছেন গঙ্গা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গোমুখের উচ্চতা প্রায় তেরো হাজার ফুট। গঙ্গা এখানে ক্ষীণাঙ্গী, কিন্তু তীক্ষ্ণ স্রোতা। পাথর থেকে পাথরে লাফাতে লাফাতে চপলচরণ মনোহরণ গঙ্গা চলেছেন এগিয়ে আপন আনন্দে আত্মহারা দুরন্ত এক শিশুর মতন। গঙ্গার জল গৈরিক। আমার সুমুখে হিমবাহ, দুপাশে আকাশছোঁয়া পাহাড়—মাথায় বরফের মুকুট। একপাশের পাহাড় চূড়ায় আলো পড়ে মনে হচ্ছে ঠিক যেন একটি

রূপোর পাহাড়। হিমবাহের মাথার কাছাকাছি তুদিকে তুটি পাখি বাতাসে ডানা মেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে সাঁতার কাটছে। তাদের চলমান ছায়া পড়ছে হিমবাহের গায়ে। পাখিও উড়ছে, ছায়াও উড়ছে। আমার মনও যেন তাদের সঙ্গে উর্ধাকাশে উড়তে লাগলো। মনের বাউলটা মনের আনন্দে গেয়ে উঠলো—'আরে শিমূল তুলা যেমন বাতাসে উড়ে গো, তুমি তেমনি উড়াইলা আমার প্রাণ······ও আমার পরাণের পরাণ।'

মাঝে মাঝে সাধুসন্ত সন্ন্যাসী মহাত্মারা আসছেন, তু-চারজন করে। স্নান সেরে বসে পড়ছেন তাঁরা ধ্যান করতে. উদাত্ত কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করে গঙ্গা মাঈর বন্দনা গাইছেন কেউ কেউ। দেশ-বিদেশের গৃহী পর্যটকরাও আসছেন তু-একজন করে মাঝে মাঝে। যাত্রী সংখ্যা এখানে নিতান্তই অল্প। আমরা নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান যে এমন একটি আশ্চর্য আলো ঝলমল সোনালী সকাল পেয়েছি গোমুখে। গোমুখের আবহাওয়া নাকি ভারি খামখেয়ালী। কুয়াশা, বৃষ্টি, তুষার বর্ষণ এখানকার নিত্য দিনের ঘটনা।

শুনেও এসেছিলাম, মুন্সিরামও বললে গোমুখ ধীরে ধীরে পিছিয়ে যাচ্ছে। আমারও মনে একটা প্রশ্ন জেগেছিল—যমুনার উৎস যদি হয় যমুনোত্রীতে, তাহলে গঙ্গার উৎস গঙ্গোত্রীতে হলো না কেন? যে হিমবাহ থেকে গঙ্গার উৎপত্তি তারও নামটি কিন্তু গঙ্গোত্রী। তাই মনে হয় এই হিমবাহ একদিন আজকের গঙ্গোত্রীতেই ছিল, তখন গঙ্গার উৎস বিন্দু গোমুখও ছিল গঙ্গোত্রীতেই। ক্রমান্বয়ে পিছু হটতে হটতে হিমবাহের সঙ্গে সঙ্গে গোমুখও আজ গঙ্গোত্রী থেকে আঠারো কিলোমিটার পথ পিছিয়ে এসেছে—নিঃশব্দে একটু একটু করে শত শত বছর ধরে, কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে।

শুনেছিলুম, কোন এক অভিধানে পড়েও ছিলুম, গঙ্গার উৎসকে গোমুখ বলা হয় তার কারণ নাকি গঙ্গার উৎপত্তি বিন্দুটি গোরুর মুখের মতো দেখতে—দেখলে মনে হবে গোরুর মুখ থেকে যেন গঙ্গা বেরোচ্ছেন। কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। বিরাট একটা হাঁ-এর মতো মনে হলেও হতে পারে, কিন্তু তাকে কোন একটি বিশেষ প্রাণীর হাঁ বলে কল্পনা করা বেশ

কষ্টসাধ্য। জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাসের "বাংলা ভাষার অভিধান"—এ 'গো' শব্দের অনেকগুলি অর্থ দেওয়া আছে। 'জল' তার অন্যতম। স্পষ্টতঃই গোমুখ বলতে জলের মুখ, অর্থাৎ জলের উৎপত্তি স্থলকেই বুঝতে হবে, আর জল বলতে ভারতবাসী গঙ্গাকেই বোঝে কারণ গঙ্গা তার মা, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সে বেঁচে আছে গঙ্গারই করুণার ওপর নির্ভর করে—নানকের কথায় তাই "এক নীর হ্যায় গঙ্গাজী", যেমন "এক নাম হ্যায় রাম।"

ডান দিকের পাহাড় চূড়ায় দেখছি কয়েকজন অভিযাত্রী চলেছে ঠিক যেন পুতুলের মতো। তারা চলেছে তপোবনের পথে. গোমুখ থেকে অনেক উঁচু দিয়ে। তপোবন থেকে বদ্রীনাথের পথে ডান দিকে বাঁক নিলেই পেঁাছে যাওয়া যাবে দিগন্ত বিস্তৃত পুষ্প সমুদ্র নন্দন কানন—Valley of flowers-এ।

প্রাণ ভরে নয়ন মন সার্থক করে গোমুখের স্বর্গীয় শোভা দেখতে লাগলাম। শৈশবের গঙ্গাকে কাছে পেয়ে নিজেরও শৈশব যেন ফিরে পেয়েছি। শিশুর মতোই প্রচণ্ড উৎসাহে কতো যে নুড়ি কুড়োলাম উপল-অধ্যুষিত বেলাভূমি থেকে তার আর লেখা জোখা নেই। প্রতিটি নুড়িই অপূর্ব উজ্জ্বল, তেমনি আশ্চর্য তার গঠন। শিশুর মতোই সঞ্চিত নুড়ির অনেকগুলোকে আবার ফেলেও দিলাম গঙ্গার জলে অথবা ডাঙ্গার ওপর! চারজনই পাত্র ভরে গোমুখের জল নিলাম, জানি কলকাতা ফিরে গেলে এই জল নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে।

প্রচণ্ড শীত সত্ত্বেও একটি একটি করে ধীরে ধীরে রয়ে সয়ে দেহের আবরণগুলি খুলে ফেললাম। তারপর গঙ্গা স্নান, অবশ্য জলে নামা সম্ভব হলো না। জল হিম শীতল। স্নান করলাম আমরা তিন জন—গৌরবাবু, গোবিন্দবাবু, আর আমি। ডঃ কর্মকার মাথা ধুয়ে নিলেন। গোবিন্দবাবু ধর্মপ্রাণ মানুষটি, পরম উৎসাহে পূজো আহ্নিক স্তোত্রপাঠে ডুবে গেলেন। গঙ্গোত্রীতেও তাঁর এই রূপই দেখেছিলাম। গৌরবাবু গদ গদ কণ্ঠে শঙ্করাচার্যকৃত গঙ্গা স্তোত্র আবৃত্তি করে চলেছেন। তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমিও গাইলুম—

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে
ত্রিভুবন তারিণি তরল তরঙ্গে।
শঙ্করমৌলি বিহারিণি বিমলে
মম মতিরাস্তাং তব পদ কমলে ॥

* * *

রোগং শোকং তাপং পাপং
হর মে ভগবতি কুমতি কলাপম্।
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে
ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে ॥

গোবিন্দবাবুকে গঙ্গা জলে তর্পণ করতে দেখে ডঃ কর্মকার বলে উঠলেন—এই হলো সত্যি সত্যি গঙ্গা জলে গঙ্গাপুজো। কিন্তু আমার ভেতর থেকে কে যেন হঠাৎই বলে উঠলো—সকল পূজোই তো গঙ্গাজলে গঙ্গা-পূজো। তাঁরই দেওয়া ফুল পাতা আলো জল ফল দিয়েই তো আমরা তাঁর পূজো করি. সকলের আরাধ্য তো সেই একজনই, যে নামেই তাঁকে ডাকি না কেন। পূজোয় মানুষের তৈরী যে সব সামগ্রী লাগে তাও তাঁরই দেওয়া জিনিস থেকেই তৈরী, তাছাড়া সবকিছু তো তাঁরই প্রকাশ।। সুতরাং গঙ্গাজল ছাড়া গঙ্গার পূজো কি কখনো সম্ভব ?

ঘণ্টা দেড়েক গঙ্গার উৎস ভূমিতে কাটিয়ে আমরা এবার ফিরে চললাম লালবাবার আশ্রমে। মিনিট কুড়ি আসবার পরই গুঁড়ি গুঁড়ি তুষারপাত শুরু হয়ে গেল। আকাশে মেঘের ঘন ঘটা। পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় ধাক্কা লেগে মেঘ জলীয় বাষ্পের রূপ নিচ্ছে। দূর থেকে মনে হয় যেন পাহাড়ের চূড়া দিয়ে প্রবল বেগে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠে আসছে আকাশে। ঐ দূরে একটা পাহাড়ের প্রায় সবটাই ঢেকে গেল জলীয় বাষ্পে, শুধু চূড়াটুকু ভাসছে আকাশে। বাতাসের বেগ বেড়ে চলেছে হু হু করে।

হঠাৎ দেখি এক নিঃসঙ্গ বাঙালী যুবক এগিয়ে চলেছে গোমুখের দিকে। আমরা জানি এখন গোমুখে আর কেউ নেই। তার ওপর তুষারপাত, তুষার ঝড়, আর পথ হারাবার সমূহ সম্ভাবনা। নিরস্ত করলুম

তাকে, পরামর্শ দিলুম পরের দিন সকাল সকাল অন্য যাত্রীদের সঙ্গে আসতে। কিন্তু শুনলো না সে। টাটানগরে থাকে। দিল্লীতে দাদা আছেন। তাঁর কাছে এসেছিল ছুটিতে। তারপর বেরিয়ে পড়েছে তীর্থ-পর্যটনে। যমুনোত্রী গঙ্গোত্রী সেরে এখন এসেছে গোমুখ দেখতে। এখান থেকে ফিরে, যাবে কেদার বদরী। নাম সুকুমার চক্রবর্তী। বেশ লাগলো এই দুঃসাহসী বাঙালী তরুণটিকে। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে সে এসে মিলিত হলো আমাদের সঙ্গে, গোমুখ পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হলো না, পরের দিন আবার আসবে। আমাদের ছাড়িয়ে সে হন হন করে এগিয়ে চলে গেল।

ঠাণ্ডায় একেবারে জমে গেছি। দস্তানা পরেও কিছু সুবিধে হয়নি, হাতের উল্টো দিকটা দেখলে মনে হয় এই বুঝি চামড়া ফেটে লাল রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসবে, সিঁদুরের মতো টক্‌টকে লাল হয়ে আছে। আঙুলগুলো খস খস করছে। নাকের ডগা, গাল, ঠোঁট বেশ বুঝতে পারছি ফাটতে শুরু করেছে। সকলের চেহারা হয়েছে ভূতের মতন।

এবার ঝির্ ঝির্ করে নয়, প্রায় ঝম্ ঝম্ করেই শুরু হয়ে গেল তুষার বৃষ্টি। বর্ষাতি পরে নেবার আগেই বেশ খানিকটা ভিজে গেলাম। ক্লান্ত হয়ে বাবার আশ্রমে পৌঁছেই বড় বড় দু গেলাস চা খেয়ে শরীরটাকে চাঙ্গা করে তুললাম, তারপর পেট ভরে গরম খিচুড়ি, তারপর নিদ্রার আয়োজন।

তন্দ্রা ছুটে গেল বাবার হাঁক ডাকে। আজ রাত্রে খাওয়ানোর আগ্রহটা বাবার যেন হাজার গুণ বেড়ে গেছে। খিচুড়ি খেয়ে সকলের পেট প্রায় ভরা। কিন্তু বাবা কোন কথাই শুনবেন না। চাপাটির পর চাপাটি চড়িয়ে যাচ্ছেন সকলের থালায়। সবজি, অর্থাৎ আলুমেশানো ডাল ঢেলেই চলেছেন।

একজন বললে—বাবা, নটা চাপাটি হলো, আর তো পারছি না।

বাবা বললেন—ভালো নয়, নয় মানে নবগ্রহ, দশ পুরিয়ে দাও দশাবতারের আশীর্বাদ পাবে। আবার বললেন—'নয়' মানে তো 'না' অর্থাৎ তুমি একটাও খাওনি, তাই আবার খেতে হবে তোমাকে।

ডঃ কর্মকার বললেন—আর নয়, রক্ষে কর বাবা।

বাবা বললেন—বাবা নয়, খাবা, খেতেই হবে তোমাকে, কোন কথাই শুনবো না। কতো কষ্ট করে কতো দূর থেকে তোমাদের জন্য আটা আলু চাল ডাল জোগাড় করে এনেছি, খাবার বানিয়েছি, খাবে না মানে? খেতেই হবে।

সত্তোর পঁচাত্তোর বছরের এক বৃদ্ধের ওপর বাবার নজরটা যেন বেশী করে পড়েছে আজ। তার কোন কথাই বাবা শুনছেন না। সে বললো —বাবা, মর্ যাউঙ্গা, অউর্ নহি।

বাবা বললেন—মর্ যাওগে তো গঙ্গামে তুম্‌কো ডাল দুঙ্গা, তুম্‌হারা স্বরগ্ বাস হো যায়েগা। ভাবনা মৎ কর, অউর্ ভি খাও। বললেন —হামারে পাশ হাতা ভি হ্যায়, তুম্ মর্ যাও তো ইস্‌সে তুম্‌হারা পিণ্ডিভি দে দুঙ্গা। প্রেমসে খা লো বাবা।

আশ্চর্যের কথা এত খেয়েও কারও কিন্তু কোন অনিষ্ট হয়নি, বরং পরের দিন শরীর বেশ ঝরঝরে লাগছিল।

লালবাবা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন ১৯৬২ সালে। তার আগে পর্যন্ত যাত্রীদের একমাত্র আশ্রয় ছিল আরও চার কিলোমিটার পেছনে চীরবাসায়। চীরবাসা চীরবনের মধ্যে পাহাড়ের নীচে ছোট্ট একটুখানি আশ্রয়। যাত্রীরা সেখানে কোন রকমে রাত কাটাতো, শয়ন ভোজনের কোন ব্যবস্থা আজও সেখানে নেই। গোমুখের আরও কাছাকাছি ভূজবনের প্রান্তে ভূজবাসার আশ্রম গড়ে তুলে লালবাবা যাত্রীদের যে কী পরম উপকার করেছেন তা বুঝতে পারবে একমাত্র গোমুখের যাত্রীরাই। এখন লালবাবার আশ্রমের ঠিক গা ঘেঁষে কারা যেন তৈরী করছে একটি পান্থশালা, পাকা বাড়ি। হয়তো অনেক আরাম আয়েশের ব্যবস্থা থাকবে সেখানে। কিন্তু লালবাবার অপূর্ব সেবা, তার পেছনে তাঁর যে মহৎ প্রাণ তার ছিটে ফোঁটাও কি মিলবে সেই পান্থশালায়? ওদের কি উচিত ছিল না আলাদা একটা আস্তানা তৈরী না করে লালবাবাকেই আর্থিক অনুদান দিয়ে তাঁর সেবা কর্মটিকে সহজ ও ব্যাপকতর করতে সাহায্য করা?

লালবাবার থেকেই জেনে নিলাম তাঁর জন্ম হয়েছিল রাজস্থানে, ১৯৩২ সালে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। এখন তাঁর বয়েস আটচল্লিশ বছর, দেখলে মনে হবে আরও কম। ১৯৪২ সালে যখন মাত্র এগারো বছরের বালক তখন তাঁর বাবা ও কয়েকজন গ্রামবাসীর সঙ্গে বেরিয়ে ছিলেন হিমালয় অঞ্চলে তীর্থ পরিক্রমায়। তারপর ঘরে আর ফেরা হলো না, দেখা হয়ে গেল গুরুর সঙ্গে। বাবার নিষেধ অমান্য করে গুরুর সঙ্গেই রয়ে গেলেন।

লালবাবাকে বললাম—পিতৃআজ্ঞা অমান্য করে আপনি কি অধর্ম করেন নি ?

তিনি বললেন—সব ছেলে কি একই রকম হয় নাকি ? কেউ বাপ মায়ের কথা শুনবে, কেউ শুনবে না এটাই তো নিয়ম, এটাই তো স্বাভাবিক। হাতের পাঁচটা আঙুল কি সমান হয় ? কী বল ?

গুরু ছিলেন বাঙালী। খড়্গপুরে তাঁর আশ্রম। রামানন্দ সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী তাঁরা। গুরু চেলার নাম রাখলেন লাল বিহারী দাস (বাঙালী নাম) যার রূপান্তর লালবাবা। লালবাবা অবস্থান করেন গঙ্গার উৎস গোমুখে, আর প্রতি বছর পৌষসংক্রান্তির দিনে হাজির হন গঙ্গাসাগরে, অর্থাৎ গঙ্গা যেখানে সাগরের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন সেই পবিত্র সঙ্গম-ক্ষেত্রে। এমনি করে প্রতি বছর গঙ্গার গতিপথ পরিক্রমা করেন তিনি —তাঁর ভাষায় 'গঙ্গার উৎপত্তি থেকে নিষ্পত্তি তক্ ঘুরে আসি ফি বছর।' সাগর স্নান সেরে তিনি এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত নানান জায়গা থেকে গোমুখযাত্রীদের সেবার জন্য অর্থ ও খাদ্য বস্তু জোগাড় করে এপ্রিলের শেষের দিকে ফিরে আসেন গোমুখে, আবার পরের নভেম্বরের মাঝামাঝি বেরিয়ে পড়েন গঙ্গাসাগর অভিমুখে।

সকালে উঠে গঙ্গোত্রী ফিরবার জন্য প্রায় প্রস্তুত হয়েছি, এমন সময় চার মূর্তি সাধু এসে হাজির হলো আশ্রমে, খুব সম্ভব ওরা আসছে ঐ ওখানে গঙ্গার ওপার থেকে যেখানে দূরে কুটিয়া বেঁধে বাস করছেন তপস্বিনী কৃষ্ণা ভারতী। কৃষ্ণা ভারতী হৃষীকেশের শিবানন্দ আশ্রমের সন্ন্যাসিনী, বয়েস প্রায় চল্লিশ।

সাধুদের মধ্যে একজন বললেন—আমরা অন্ধ সুরদাসকে সঙ্গে করে নিয়ে চলেছি, কিরূপা করে কিছু দান করুন তাকে। সাধুগুলির চেহারা নিতান্তই সাধারণ, পোশাক পরিচ্ছদেও সাধুত্বের বিশেষ কোন লক্ষণ নেই। শুনতে চাইলুম সুরদাসের গান। সে গেয়ে চললো—

কুছু লেনা ন দেনা মগন রহনা
পাঁচু তত্ত্বসে বন্‌হে পিঁজারা
ইস্‌মে বইঠে হ্যায় মোরা ময়না
কুছু লেনা ন দেনা মগন রহনা।
গহড়ি নদীয়া অগম বহে
ধারা খেবনবালে কেবটিয়া মিল্‌কে রহনা
কুছু লেনা ন দেনা মগন রহনা।
ব্রহ্মানন্দ কো ধ্যান লাগায়ো
ইয়া জ্যোতিসে জ্যোতি জগল রহনা
কুছু লেনা ন দেনা মগন রহনা।
মিটিকো তন্‌সে গুমান মতি করনা
অউর্ উড় যায়গা ময়না রহ খাগকে তেরা
কহতনি কবীরা শুন ভাইয়া সাধু
হা গুরুকে চরণমে লোপট রহনা
কুছু লেনা ন দেনা মগন রহনা।

সুরদাসের গানে সে কি অপূর্ব মূর্ছনা - কী দরদ দিয়ে সে গাইছে, কী মধুর তার কণ্ঠ, কী গভীর তার উপলব্ধি, বুঝতে পারছি অন্ধ সুরদাসের সমস্ত অন্তর্লোক এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে ভরে গেছে। তার এখনকার অবস্থা 'জ্যোতিসে জ্যোতি জগল রহনা'। সুরদাস, কে বলে তুমি অন্ধ, তুমি তো ভাই সার বস্তু চিনে ফেলেছো, আমাদের চেয়েও চক্ষুষ্মান তুমি। চোখ থেকেও আমরা অন্ধ, পেয়েও আমরা অতৃপ্ত, না পাবার মর্মবেদনায় জর্জরিত, অভিমানে গুমরে ধরাকে আমরা সরা জ্ঞান করছি, রূপের গুমর, ধনের গুমর, জ্ঞানের গুমর, আরও কত কী, মাটির গড়া এই দেহটার

ওপর দরদ আমাদের কত। ভুলে যাই যে কোন মুহূর্তেই প্রাণ ময়না উড়ে যেতে পারে এই মাটির পিঞ্জরটাকে পেছনে ফেলে। সুরদাসের গান শুনে সকলেই নিশ্চল, শুধু করতালি দিয়ে নৃত্য করছেন লালবাবা, আর বার বার গেয়ে উঠছেন—হা, গুরুকে চরণমে লোপট রহনা।

আশ্রম ছেড়ে এগিয়ে চললাম গঙ্গোত্রীর পথে। সুরদাসের দল চলেছে আমার আগে আগে। দলের সবার শেষে সুরদাস, সুরদাসের পেছনে আমি। আমার সঙ্গীরা পিছিয়ে আছেন, আমি সাধুদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছি, চলেছি সুরদাসকে দেখতে দেখতে, তার কথা শুনতে শুনতে। সুরদাস যে আমাদের চেয়েও বেশী চক্ষুষ্মান তা বাস্তব অর্থেও যে কত সত্যি তাই দেখছি। কেউ তার হাত ধরে নেই। সে দলের সকলের পেছনে। সম্বল শুধু হাতের লাঠিটুকু, আর সামনের লোকের কিছু কিছু নির্দেশবাণী। অবাক হয়ে দেখছি সেই দুর্গম কঠিন পথে নিভু্ল পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে সুরদাস, চলার গতিও বেশ দ্রুত। বিহারের সমস্তিপুর জেলায় সুরদাসের জন্ম। বয়েস যখন মাত্র পাঁচ তখন বসন্ত রোগে দুটো চোখই খোয়া যায়। বললো মা দয়া করে চোখ দুটি ফিরিয়ে নিলেন। সে ভাইবোনেদের সবার ছোট। বিয়ে থা করেনি। বাবা মা যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন তাঁদের সেবা করেছে। সন্ন্যাস নিতে পারেনি, কারণ মা-বাবার সেবাই হল শ্রেষ্ঠ ধর্ম। মা মারা গেছেন অনেক আগে, বাবা গত হয়েছেন মাত্র বছর পাঁচেক হলো। তারপর থেকেই সে সাধু হয়ে বেরিয়ে পড়েছে ঘরসংসার ছেড়ে। তারা কবীরপন্থী রমতা সাধু। নির্দিষ্ট কোন আস্তানা নেই তাদের, বহতা নদীর মতোই শুধু পথ বেয়ে চলেছে তারা, কোন জায়গায় ত্রিরাত্রির বেশী থাকা তাদের মানা। সুরদাসেরা এগিয়ে গেল, আমি পথের ধারে দাঁড়িয়ে রইলুম সঙ্গীদের অপেক্ষায়।

সঙ্গীরা যখন এসে পৌছোলেন তখন সাধুর দল উধাও হয়ে গেছে। চলতে চলতে এক জায়গায় এসে খেয়াল হলো ডঃ কর্মকার যিনি এ পর্যন্ত সবার পিছে পিছে আসছিলেন কোন্ মন্ত্রবলে জানি না তিনি আমাদের সবাইকে ছাড়িয়ে অনেকদূর এগিয়ে গেছেন। আপ্রাণ চেষ্টা করেও

তাঁকে কিছুতেই ধরতে পারছি না। তারার ইচ্ছে হলে কী না হয়, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্—সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।

কিছু দূর যাবার পর চেয়ে দেখি আমাদের সঙ্গ নিয়েছে এক বৈষ্ণব। পাতলা গড়ন। রঙটি কালো। গলায় কণ্ঠি। হাঁটতে পারছে না, হাঁপাচ্ছে। গজ গজ করে আপন মনে গজরাতে গজরাতে বলে চলেছে—আর পারিনে বাপু, রাস্তা যেন দিনে দিনেই খারাপ হচ্ছে। বললুম—কেন বলছো এমন কথা? বললে এটা নিয়ে তার চারবার হলো গোমুখ আসা, আগে আগে রাস্তা এত খারাপ ছিল না। থাকে সে নবদ্বীপে। নামটি কালিদাস বাবাজী। রাস্তা দিনে দিনে খারাপ হচ্ছে কিনা জানিনা, তবে বাবাজী যে দিনে দিনে বুড়ো হচ্ছেন একথাটা তিনি স্রেফ্ ভুলেই গেছেন মনে হয়।

বললুম—এ বয়েসে এতটা কষ্ট করে তবে আবার আসা কেন?

বাবাজী বললে—সাধে কি আর এসেছি বাবু! ছেলে মলো, বৌ পালালো। ছিল একটা মেয়ে। খাইয়ে পরিয়ে তাকে বড়সড়টি করলুম, আর অমনি একদিন বুড়োকে ছেড়ে ফুড়ুৎ করে সেও উড়ে পালালো মনের মানুষ জুটিয়ে নিয়ে। সমস্ত বুকটা খাঁ খাঁ করছে বাবু, ভেতরে ভেতরে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছি। সেই জ্বালা জুড়োতেই তো আবার আসা গঙ্গা মাঈর কাছে।

তার দুচোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়লো।

এদিকে গৌরবাবুর পায়ের অবস্থা খুবই খারাপ। কুয়াশার কামড়ে (frost bite) ডান পাটা জখম হয়ে হাঁটতে পারছেন না, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছেন কোনক্রমে। মুন্সিরাম এগিয়ে গেছে, গঙ্গোত্রী থেকে আমাদের জন্য খাবার নিয়ে ফিরে আসবে।

আরে, কী আশ্চর্য এই জায়গাটা। এযে সব রকমের মাটি আর পাথর দিয়ে তৈরী পাহাড় আর প্রান্তর খণ্ডের ছড়াছড়ি। নদীর জল কোথাও সবুজ, কোথাও নীল, কোথাও কালো, কোথাও বা ফেনিল শুভ্র। বাতাস বইছে ঝরঝরিয়ে, তার দোলা লেগে গাছপালা মন্দ মন্দ দুলছে,

পাতাপত্তর কাঁপছে, থমকে দাঁড়ালে মর্মরধ্বনি শোনা যায়। নীল নির্মল আকাশ মনটাকে একেবারে উদাস করে দিচ্ছে। পাহাড় চূড়ায়, গাছের চিকন পাতায়, জলে, মাটির রঙে সূর্যের আলো পড়ে সে এক বিচিত্র আভার সৃষ্টি হয়েছে দিঙ্‌মণ্ডলে। এই সবকিছুর সমন্বিত রূপটি অবর্ণনীয়, না দেখলে কিছুতেই বোঝানো যাবে না। মনে হয় এ যেন ক্ষিতি অপ্‌ তেজ মরুৎ ব্যোম-এর বিস্ময়কর একীকরণে গঠিত একটি সম্পূর্ণ সত্তা, যেন স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল স্বয়ংসম্পূর্ণ সুন্দর একটি জগৎ, এই ধরণীর সীমানার বাইরে। এখানে শুধু পঞ্চভূতের জড় রূপটিই নয়, জীবন্ত রূপটিও অনায়াসে মন কেড়ে নেবে। এখানে জড়ের পাশে আছে অপর্যাপ্ত জঙ্গম—কতো রকমের উদ্ভিদ, অজস্র ঝোপঝাপ লতাগুল্ম থেকে শুরু করে বিরাট বড় বড় বনস্পতি পর্যন্ত, আর কতো রকমের পতঙ্গ আর পাখি। নীল হলুদ বেগ্‌নী রঙের পাখনা মেলে দিয়ে প্রজাপতির দল বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে ললিত ছন্দে। পথের পাশে লতাগুল্মে ফুটে থাকা ফুলের মধ্যে চোখে পড়বে মধর নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা মৌ-চোর মৌমাছি আর নাম-না-জানা কত রকমের পতঙ্গ, ডালে ডালে হাজার রঙের হাজার সাজের হাজার হাজার পাখি—কণ্ঠে তাদের সপ্ত সুরের লীলা লহরীর আনন্দ ঝংকার খেলছে। এ যেন একটি সুরলোক ! বসে পড়লুম একটা পাথরের ওপর। বন্ধুরা আসছেন পেছনে। ততক্ষণে ধরণীর ধূলায় এই যে স্বর্গটি রচিত হয়েছে প্রাণ মন ভরে তার সুষমাটি দেখে নিই।

হঠাৎ খস্‌ খস্‌ শব্দ শুনে ডাইনে চোখ ফেরালাম। দেখি এক বিশালকায় সাধ গাছপালা সরাতে সরাতে ওপর থেকে নেমে আসছেন দৃঢ় পদক্ষেপে। এমন দীর্ঘ আর এমন বিপুলদেহী সাধু আমি এর আগে আর কখনো দেখিনি। কৌপীন পরা। সারা অঙ্গে ছাই মাখা। মাথা থেকে জটার ঝুরি নেমে এসেছে বিশাল বক্ষদেশ পর্যন্ত। এক হাতে ত্রিশূল, অন্য হাতে কমণ্ডলু। চোখে-মুখে এক অনির্বচনীয় স্বর্গীয় দীপ্তি। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নীরবে পথ বেয়ে নেমে গেলেন সন্ন্যাসী। অবর্ণনীয় এক আনন্দ আর বিস্ময়ে আমার মনটি তখন কানায় কানায়

ভরে উঠেছে। অসহ্য সুখে সমস্ত শরীরটা টলমল করে কাঁপছে, তাঁকে দেখে আমি উঠে দাঁড়িয়েছি। অবাক চোখে তাকিয়ে রইলাম তাঁর পথের দিকে। নিমেষের মধ্যেই তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বন্ধুরা এসে পড়লেন। সবাই মিলে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ পাহাড়ের ওপর থেকে কাঠ কাটা থামিয়ে গাড়োয়ালী এক কাঠুরে আপনা থেকেই বলে উঠলো—মহাত্মা কা কোঠি হ্যায় জী, উন্‌কে সাথ ভেট্ করনা! আশ্চর্য আমি তো তাই চাই। মনে মনে ভাবছি এই সময় যদি মুন্সিরাম এসে পড়তো তাহলে বন্ধুরা এখানে বসে খাবার খেতে থাকতেন, আর সেই ফাঁকে আমি গিয়ে মহাত্মা গঙ্গাদাসকে দেখে আসতাম। বড় ইচ্ছে তাঁকে দেখবার।

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। চেয়ে দেখি ঠিক সেই মুহূর্তেই মুন্সিরাম সেখানে হাজির। গোবিন্দবাবুও সাধুদর্শনের জন্য ব্যাকুল। কালক্ষেপ না করে দুজনে গঙ্গাদাসজীর আশ্রমের পথ ধরলুম। কী ঢালু পিচ্ছিল আর সংকীর্ণ সেইপথ—ওপর থেকে সোজা নেমে গেছে গঙ্গার দিকে। ধীরে ধীরে চলবার উপায় নেই, দ্রুতবেগে গড়গড়িয়ে ছুটে চলতে হবে, থামলে বিপদ, পা ফস্কালে নিশ্চিত পতন, আর তা হবে অভ্রান্ত অন্তিম পতন। মুন্সিরামও চলেছে আমাদের আগে আগে।

আশ্রমে পৌঁছে দেখি স্থানটি কী অদ্ভুত সুন্দর। পাহাড়ের কোলে চীর গাছের নীচে কাঠের তৈরী ছোট্ট একটু বাড়ি—কয়েকটি মাত্র ঘর। একটিতে রাম মন্দির, একটিতে সাধু নিজে থাকেন, বাকিগুলি মনে হলো কেউ ব্যবহার করে না। জানি না মাঝে মাঝে অন্য কোন উচ্চকোটি সাধু এঁর সঙ্গে এখানে এসে থাকেন কিনা। তবে শুনেছি গঙ্গাদাসজী একাই থাকেন তাঁর এই কুটিয়ায়। সামনেই অমৃতবাহিনী গঙ্গা। ঠিক ওপারে বনাচ্ছন্ন বিরাট পর্বত নীল আকাশ ফুঁড়ে ঊর্ধ্বে অদৃশ্য হয়ে গেছে। অমৃত ঘাট নামটি সত্যিই সার্থক—এখানে আকাশ বাতাস নদীর জল সবই যেন অমৃতময়, মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। সমস্ত স্থানটি জুড়ে বিরাজ করছে একটি সুমধুর নির্জনতা, একটি আনন্দঘন

স্বর্গীয় সুখানুভূতি। আমরা যখন আশ্রমে পৌঁছোই তখন মহাত্মা ভোজন করছিলেন অন্ধকার কুটিয়ার ভেতর। ভেতর থেকে বলে উঠলেন —ব্যয়ঠো, ম্যা খানা খা কর্ আরহা হুঁ। আমরা আসবার আগেই আর একজন এসে বসেছিল। সহজেই বোঝা গেল সে বোবা। মহাত্মা বেরিয়ে এলে আমরা তাঁকে প্রণাম করলাম। এতো বড় সাধু, কিন্তু পোশাকে পরিচ্ছদে কথায় বার্তায় সাধুগিরির বিন্দুমাত্রও প্রয়াস নেই। দীর্ঘ চেহারা, ক্ষীণ দেহ। বয়েস মনে হলো সত্তোরের ওপর। মাথায় ফেট্টি বাঁধা। গায়ে ঢিলেঢালা আলখাল্লা। তিনি সঙ্গে করে আমাদের নিয়ে চললেন মন্দিরে। রামলালার মূর্তিটি ঠিক বালগোপালের মতো, রামকৃষ্ণ যে রকম রামলালার খপ্পরে পড়েছিলেন ঠিক সেই রকম। গঙ্গাদাস রামলালার প্রসাদ কিশমিশ মেশানো নকুলদানা আর চরণামৃত দিলেন আমাদের হাতে। আমরা কে কী কাজ করি তার খোঁজ খবর নিলেন, ভগবানে বিশ্বাস রেখে কাজ করে যেতে বললেন। এই নির্জন পাহাড়ে সাঁইত্রিশ বছর ধরে সচ্চিদানন্দের ধ্যানে বিভোর হয়ে আছেন গঙ্গাদাস. গঙ্গার দাস গঙ্গার করুণা সম্বল করেই যে পড়ে আছেন এখানে তার সামান্য পরিচয় পেলাম যখন দেখলাম তিনি রামলালাকে দেওয়া আমাদের প্রণামী দুটি টাকার মধ্যে পুরো একটাই দিয়ে দিলেন সেই বোবা যাত্রীটিকে। টাকাটি তার হাতে দিয়ে বললেন-- যাও, ইনকে সাথ চলে যাও। আর একটা টাকা আর কোন্ যাত্রীর জন্য তোলা থাকলো কে জানে। যাঁর ভার নিয়েছেন মা গঙ্গা তাঁর আবার সঞ্চয়ের দরকার কী? মহাত্মার সান্নিধ্যে অল্প কিছুক্ষণ কাটিয়ে উজ্জীবন লাভ করে পথের ওপরে উঠে এলাম। আরও অনেকক্ষণ থাকবার ইচ্ছে ছিল তাঁর কাছে, কিন্তু উপায় ছিল না, থাকলে আরো কত অমৃতময় বাণী শুনতে পেতাম তাঁর শ্রীমুখ থেকে, কিন্তু তেমন ভাগ্য তো আর করে আসিনি। সেই দুস্তর খাড়াই পথ বেয়ে ওপরে উঠতে প্রাণান্তকর অবস্থার সম্মুখীন হোলাম পদে পদে। শেষে তারা মায়ের অশেষ করুণায় হাঁপাতে হাঁপাতে অক্ষত শরীরেই বন্ধুদের সঙ্গে এসে পুনর্মিলিত হোলাম।

বৃষ্টি পড়ছে। বাতাসের বেগও বাড়ছে ক্রমে ক্রমে। এখনও অনেকটা পথ অতিক্রম করা বাকি। তুমি জানো না কী অমূল্য নিধি তুমি ফেলে চলে যাচ্ছো। এই আসাই হয়তো এখানে তোমার শেষ আসা। দুচোখ ভরে প্রাণ মন সার্থক করে দেখে নাও হিমালয়ের এই অপরূপ আশ্চর্য রূপরাশি। সংসার জীবনে ফিরে গিয়ে কাকে কী দিলে, কার কাছে কী পেলে তার হিসেব মেলাতে না বসে মগ্ন থেকো হিমালয়ের ধ্যানে। মনে রেখো সুরদাসের কণ্ঠে ধ্বনিত কবীরের সেই সুমহান বাণী —কুছ্ লেনা ন দেনা মগন রহনা।

কেদারনাথ

গঙ্গোত্রী গোমুখ দেখে কেদারনাথের পথে গত কাল উত্তরকাশী এসে পৌঁছোলুম সন্ধ্যেবেলা। দূর থেকে পাহাড় জুড়ে আলোর মেলা দেখতে ভারি ভালো লাগছিল। শহরের মধ্যে ঢুকে মনটা যেন জুড়িয়ে গেল। একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিপাটি শহর উত্তরকাশী। আশ্চর্য, মাত্র প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে লেখা 'প্রবাস-চিত্র' গ্রন্থে জলধর সেন উত্তরকাশীর যে বর্ণনা দিয়েছেন, আজকের উত্তর কাশীর সঙ্গে তার এক ফোঁটাও মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখন অনায়াসে বাসে চড়েই উত্তরকাশী পৌঁছে যাওয়া যায়, তখন পায়ে হেঁটে আসা ছাড়া উপায় ছিল না। পথ ছিল ভয়ানক দুর্গম এবং বিপদসংকুল। শুধু অত্যন্ত দুঃসাহসী নির্ভীক কষ্টসহিষ্ণু মুষ্টিমেয় কয়েকজন গঙ্গোত্রীর যাত্রী ছাড়া আর কেউ সাহস করতো না এ পথে পা বাড়াতে। তখন উত্তর কাশী ছিল মুক্ত প্রকৃতির মাঝখানে প্রশান্তিমণ্ডিত ছোট্ট একটি লোকালয় মাত্র। বিশ্বেশ্বরের মন্দির ঘিরে খুব জোর একশোটি পর্ণকুটীর ছিল, অধিবাসীরা ছিলেন সৎ সরল এবং নির্লোভ। তাঁদের জীবনযাত্রা ছিল নিতান্তই অনাড়ম্বর। আশ্রমবাসী ঋষিদের মতোই সহজ এবং অধ্যাত্ম চেতনায় সমৃদ্ধ ছিল তাঁদের জীবন। আর আজ, মাত্র এই কয়েক বছরের ব্যবধানে সেদিনকার উত্তর কাশীর কিছুই আর বাকি নেই —আজ সে ক্রমবর্ধমান বিরাট একটি শহর মাত্র; বড় বড় অট্টালিকা আর বিলাস ব্যসনের সকল রকম জাঁক জমক চাকচিক্য চতুর্দিকে ছড়ানো, শহুরে জীবনের আনুষঙ্গিক সব রকম কৃত্রিমতা, শঠতা আর প্রবঞ্চনার নিষ্ঠুর চাপে সেই সহজ জীবনের আনন্দধারাটি একেবারেই শুকিয়ে গেছে।

সারি সারি দোকানে কত রকমের পণ্য থরে থরে সাজানো রয়েছে। এক'দিন ফলমূল শাক সব্‌জি দেখিনি বললেই হয়। হরেক রকমের ফল আর আনাজের বিপুল সমারোহ দেখে চোখ দুটি জুড়িয়ে গেল। বাবা কালী

কমলীওয়ালা পাঞ্চায়েৎ ক্ষেত্রে ঠাঁই মিলেছে রাতের মতো। দোতলার ওপর ঘর। ওপাশের বারান্দায় দাঁড়ালেই চোখে পড়বে গঙ্গা। গঙ্গার কলতান শুনতে পাচ্ছি। এ'কদিন যেখানে থেকেছি যে পথ দিয়ে চলেছি সব সময়ই সঙ্গে থেকেছেন গঙ্গা। দুচোখ ভরে দেখেছি তাঁর রূপ, দুকান ভরে শুনেছি তাঁর গান। বারান্দায় দাঁড়িয়ে গঙ্গার শোভা দেখছিলাম— নদীর জলে চাঁদের আলো পড়েছে, আকাশ জুড়ে অজস্র তারকার ঝিকিমিকি, দু চারটে তারা জ্বল জ্বল করে জ্বলছে।

আজ ভোর সাড়ে চারটেয় বাস ছাড়লো। টেহ্‌রি পর্যন্ত আসবার পর কেদারনাথের পথ পাওয়া গেল। পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে চলেছে আমাদের বাস। যেদিকে তাকাই সেদিকেই পাহাড়। কিন্তু গঙ্গোত্রী গোমুখ দেখে আসবার পর এই সব পাহাড়কে নিতান্তই ছোট আর অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হচ্ছে। বাসের রাস্তাও বেশ প্রশস্ত। কিন্তু তাহলে কী হবে, প্রতি মুহূর্তেই মোড় ঘুরতে ঘুরতে আর বাঁক নিতে নিতে রাস্তা চলেছে ছুটে। মনে হচ্ছে যেন অবিরাম লাট্টুর মতোই ঘুরে চলেছি। পৃথিবীর আর কোন রাস্তাই বুঝি এতবেশী ঘুরন্ত নয়। রাস্তার দুপাশে পাহাড়ের কোলে কোলে ছোট বড় গ্রামগঞ্জ—ঘরবাড়ি আবাদি জমি বরাবর চলে গেছে। পাহাড়ের ওপর স্তরে স্তরে বাড়ি।

কোথাও কোথাও পাহাড়ের অনেক ওপরে ঘোড়ার পাল চরে বেড়াচ্ছে। ঝর্ণার পর ঝর্ণা নেমে আসছে পাহাড়ের গা বেয়ে। পাহাড়ের ওপর আলোছায়ার খেলা দেখবার মতো। একপাশ ঝলমল করছে সূর্যের আলোয়, আর একপাশ কালো হয়ে আছে গভীর ছায়ার ওড়না টেনে। দূরত্ব অনুযায়ী এক একটা পাহাড়ের রঙ এক এক রকম। কেউ সবুজ, কেউ ধূসর, কেউ নীল কেউ বা প্রায় কালো।

দুগ্‌গড়ি, কীর্তিনগর এই রকম আরও কত গ্রাম শহর ছাড়িয়ে বাস এসে দাঁড়ালো শ্রীনগরে। এই শ্রীনগর ভূস্বর্গ কাশ্মীরের রাজধানী না হলেও তার শ্রীটি কিন্তু কোন অংশেই কম নয়। চারপাশে পাহাড়, মাঝখানে শহর শ্রীনগর। বৃটিশ গাড়োয়ালের রাজধানী ছিল এখানে।

যাত্রীরা টিকা নিয়েছে কিনা যাচাই করা হয় এখানে। লেখা আছে—"হৈজেকে টিকে কী প্রমাণ পত্র মাঁগে জানে পর তুরন্ত্ দেখানা চাহিয়ে।"

শ্রীনগর একটি পাহাড়ী শহর। এখানে বেতার কেন্দ্র, টেলিফোন কেন্দ্র এবং আরও অনেক আপিস কাছারি আছে। বেসাতীরা নানান রকম ফল এবং খাদ্য বস্তুর আমদানি করেছে বাস স্ট্যাণ্ডের আনাচে কানাচে, কিন্তু কিরায়া বা ভাও, অর্থাৎ দাম অসম্ভব রকমের বেশী। ক্ষিদে পেয়েছিল দারুণ। তাই আপেল কমলালেবু শশা আলুবোখারা আর বাদাম ভাজা কিনে পেট ভরানো গেল। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট শ্রীনগরে বিশ্রাম নেবার পর বাস আবার নতুন উদ্যমে যাত্রা শুরু করলো। বেশ কিছুটা দৌড় দেবার পর থামলো এসে রুদ্রপ্রয়াগে। রুদ্রপ্রয়াগ ছেড়ে আসবার অল্লক্ষণ পরেই কিন্তু বাসের একটা টায়ার গেল ফেটে। সবাই নেমে দাঁড়ালাম পথের ওপর। জনৈক সাধু সহযাত্রী থেকে থেকেই গেয়ে উঠছিলেন—"জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ মিলা দে।" মনে তাঁর কোন রকম বিকার নেই। বাস আর পথ দুই-ই তাঁর কাছে সমান। বাস ছাড়বার কিছুক্ষণ পরে দেখি ছোট ছোট কাঠের তক্তা তার দিয়ে বেঁধে বেঁধে একটা সাঁকো তৈরী হয়েছে, আর তারই ওপর দিয়ে অনায়াসে একজন মানুষ এপারে চলে আসছে।

রুদ্রপ্রয়াগ ছাড়িয়ে আসার পর বুঝতে পারছি পাহাড়ের উচ্চতা ক্রমে ক্রমেই বেড়ে চলেছে। দূরে একটা পাহাড় দাঁড়িয়ে, মাথায় তার বরফের মুকুট।

এতক্ষণ মন্দাকিনীর কিনার ঘেঁষে চলছিলাম, এবার সঙ্গ নিলেন অলকানন্দা। মন্দাকিনী কিন্তু মন্দগামিনী ছিলেন না, অথচ অলকানন্দার চলনে তেমন যেন তাগিদ নেই। তিনি চলেছেন আপন মনে, নিতান্তই মন্থর গতিতে, একেবারে মন্দাক্রান্তা ছন্দে। জল তুঁতে গোলা জলের মতোই নীল। পাশের যাত্রী বলে উঠলেন—আহা, এমনি নীল ছিল যমুনার জল দ্বাপর যুগে, ঠিক যেন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ কান্তির মতো। যমুনার জল তাই তো রাই কিশোরীর এত ভালো লাগতো।

পাহাড়ের সেই কতো ওপরে গ্রামের ঘরবাড়ি, তারপর চাষের জমি সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে নেমে এসেছে একেবারে অলকানন্দার জলের কিনার পর্যন্ত। পেরিয়ে এলাম তিলাওয়াড়ার রেজিন আর তার্পিন ফ্যাক্টরী। বিজয়নগরে এসে এত বড় সবুজ সমতল মাঠ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এত উঁচুতে এই পাহাড়ের রাজ্যে এমন বড় সমতল ক্ষেত্র এর আগে তো আর চোখে পড়েনি। বিজয়নগরে একটা স্কুল আছে শুনলাম। খুব সম্ভব স্কুলের ছেলে মেয়েরা এই মাঠটায় খেলাধূলো করে। এখানে বন বিভাগ থেকে চীর গাছের নিবিড় চাষেরও আয়োজন চলেছে।

গোমুখ যাবার পথে চীরবাসার ঘন বনচ্ছায়ে বাঁকুড়ার যে তরুণ সাধুটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল এখন দেখি সেও চলেছে আমাদের সঙ্গে একই বাসে, যাবে কেদারনাথ, তারপর বদ্রীনাথ। এদেশের লোকেদের সঙ্গে কেমন সুন্দর মিশে গেছে। যখন যার তখন তার। পরমানন্দে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠিক যেন ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ানো গুঞ্জনরত মৌমাছিটির মতো।

বাস ভিড়িঙ্গিফাটা উখিমঠ গুপ্তকাশী দেবীঘাট শোনপ্রয়াগ ছাড়িয়ে সন্ধ্যের কাছাকাছি হাজির হলো গৌরীকুণ্ডে। গৌরীকুণ্ড একটা ছোট্ট পাহাড়ের কোলে একফালি একটি জনবসতি। একটি মাত্র রাস্তা পাহাড়ের এপ্রান্ত হতে ওপ্রান্ত পর্যন্ত সোজা চলে গেছে। ঘরবাড়ি দোকান বাজার পান্থনিবাস যা-কিছু সবই তার দুপাশে। লোকজন গিজ্ গিজ্ করছে। বাস থেকে নামতেই একদল পাণ্ডা এসে ছেঁকে ধরলো আমাদের। সবাইকে ভাগিয়ে দেওয়া গেল, কিন্তু একজন নাছোড়বান্দা, কিছুতেই সে আমাদের ছাড়বে না। যাতায়াত এবং আস্তানার ব্যাপারে গৌরবাবুর সিদ্ধান্তই মোক্ষম। অগত্যা খোঁড়া পা নিয়ে গৌরবাবুই চললেন পাণ্ডার আস্তানার চেহারা দেখতে। গোবিন্দবাবু সঙ্গ নিলেন তাঁর। আমি আর ডঃ কর্মকার আমাদের জিনিসপত্র আর নির্বাচিত দুই কুলী নিয়ে একটা দোকানের পাশে অপেক্ষা করতে লাগলাম ওঁদের জন্যে। মিনিট পঁয়ত্রিশ পরে গৌরবাবুরা ফিরে এলেন, সঙ্গে সেই পাণ্ডা।

আস্তানা তাঁদের পছন্দ হয়নি শুনে পাণ্ডার সে কী আস্ফালন। রেগে মেগে সে গজ্ গজ্ করতে করতে চলে গেল। গৌরবাবু খোঁড়া পা নিয়ে এবার নিজেই বেরোলেন আস্তানার সন্ধানে। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এসে বললেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। পাণ্ডাটি পাশাপাশিই ছিল। গৌরবাবুর কথা শুনে তার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠলো। সে বললে—আরে ছোঃ ছোঃ ওখানে আবার থাকা যায় নাকি, অথচ সব্বাই দৌড়োবে সেখানে, সাধুগুলো যাদু জানে দেখছি।

বুঝতে পারলুম ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ এখানে যত বেশী জনপ্রিয় হচ্ছে পাণ্ডাদের ব্যবসায়ে ততই মন্দা ঘটছে, আর এই মহৎ প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে তাদের আক্রোশও বেড়ে চলেছে সেই হারে। রাস্তার একেবারে অপর প্রান্তে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। তারই পাশে উষ্ণকুণ্ড, গৌরীকুণ্ড। আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত তরুণ ব্রহ্মচারী দেবনারায়ণ নবীন যুবা হলেও ব্যবস্থাপনায় রীতিমত বৃদ্ধ—যথাসাধ্য সাহায্য করে চলেছেন সবাইকে খুশিমুখে। তপ্ত কুণ্ডে স্নান করে শরীর তাজা হয়ে উঠলো। তারপর ডুধ ডাল তরকারি সহযোগে রুটি দিয়ে নৈশ আহার সমাধা করে বিছানার কোলে আশ্রয় নিলাম।

রাস্তা ছাড়িয়ে পাহাড়ের আরও ওপর দিয়ে কেদারনাথ যাবার পথ। ওপরে উঠেই ভাড়া করার জন্য ঘোড়া পাওয়া যায়। গাদা গাদা ঘোড়া রয়েছে সেখানে। গৌরবাবুর পায়ের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ধাবরানী থেকে গাংনানী পর্যন্ত তাঁকে কাণ্ডি চড়ে আসতে হয়েছিল। এক সময় কাণ্ডি নেবার জন্য তিনি ডঃ কর্মকারকে পীড়াপীড়ি করছিলেন। তখন কে জানতো কয়েক ঘণ্টা পরে তাঁরই কাণ্ডির প্রয়োজন হবে, ডঃ কর্মকারের নয়। ডঃ কর্মকার এখনো ঠিক আছেন। আমরাও মোটামুটি চালিয়ে যাচ্ছি। শুনে এসেছিলুম গৌরীকুণ্ড থেকে কেদারনাথের দূরত্ব মাত্র পাঁচ

কিলোমিটার, কিন্তু এখানে এসে জানা গেল পাঁচ নয়, চৌদ্দ। অথচ হাতে আমাদের আর মাত্র পাঁচ-ছ'টা দিন বাকি। কেদারনাথের পর যেতে হবে বদ্রীনাথ। তার ওপর এই সবে গাংনানী থেকে ধাবরানী, লঙ্কা থেকে ভৈরোঁঘাটি আর গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ যাওয়া আসায় সুদীর্ঘ ষাঠ কিলোমিটার চড়াই উৎরাই পদব্রজে অতিক্রম করে এলাম। ক্লান্তির ভারে শরীর একেবারে অবশ হয়ে পড়েছে। সব দিক বিচার করে ঠিক করা গেল চারজনে চারটে ঘোড়া নেবো। চারটি ঘোড়া জোগাড়ও করা গেল। তারপর যাত্রা শুরু করলাম সকাল সাড়ে নটায়।

ঘোড়া জোগাড় করা সে এক বিরাট বিভ্রাট। আমাদের ঘোড়া জুটলেও কোন ঘোড়াওয়ালা গৌরবাবুকে নিতে সহজে রাজী হয়না, তাঁর অপরাধ বপুটি তাঁর বিশাল। শেষে অনেক তর্কাতর্কির পর একজন রাজী হয়ে গেল। ভাড়ার পরিমাণ ঠিক করার জন্য সে বহুবার গৌরবাবুর কোমর জড়িয়ে তাঁকে তুললো নামালো। অবশেষে ঠিক হলো আমাদের তিন জনের ভাড়া হবে সত্তোর টাকা করে, গৌরবাবুর নব্বুই, বখশিস বাদে।

যার যেমন ওজন তার তেমন দাম। পদের ওজন বিদ্যার ওজন জমিজমার ওজন যার যত বেশী সমাজের চোখে তার দামও তত বেশী। নিজের নিজের ওজন বাড়াবার জন্য সবাই তাই অতি ব্যস্ত, কখনো কখনো ব্যতিব্যস্তও। অনেক সময় আবার নিজের ওজন ঠিক মতো না বুঝে আমরা অন্যের ওপর আমাদের ভার চাপাতে গিয়ে নাজেহাল হয়ে পড়ি, তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। তবে আয়তন দেখে সব সময় ওজন বোঝা যায়না। এক টুকরো পাথর অনেক সময় এক ঝুড়ি ফুলের চাইতেও ভারি হয়। চেহারার আকার আয়তন দেখে বা ধরণ ধারণ দেখে কারো ওজন ঠাহর করতে গেলে অনেক সময়ই ঠকতে হয়, যেমন হয়েছিল বামনাবতারের বেলায় বলী রাজাকে। বলী পারেননি ঠিক মতো বামনাবতারের ওজন বুঝতে, আর তাঁর নিজেরও। কাউকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা বা সামান্য ভাবা ঠিক নয়, কে জানে কার ওজন কী রকম। ঘোড়াওয়ালার মতো কারো ওজন ঠিক করতে হলে তার নিকট

সান্নিধ্যে আসতে হবে, নানাভাবে তাকে পরখ করে দেখতে হবে। অনুমান নয়, প্রত্যক্ষ উপলব্ধিই ওজন ঠাহর করবার একমাত্র নির্ভুল পন্থা। ওজন দাঁড়ি দিয়ে স্থূল ওজন জানা গেলেও ওজনটা ঠিক কী রকম বুঝতে হলে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ছাড়া গত্যন্তর নেই।

দুপাশে পাহাড় ঢালু হয়ে নেমে গেছে, মাঝখানে বয়ে চলেছেন মন্দাকিনী। তাঁর নিঃস্বন অবিরাম শুনতে পাচ্ছি। ওপারের পাহাড় বরাবর গভীর অরণ্যভূমি চলেছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। এত পাহাড় দেখে এলাম, কিন্তু পাহাড় ভরা এত গাছ এমন নিবিড় বন আর কোথাও চোখে পড়েনি। পথ ঘুরপাক খেতে খেতে ক্রমশ ওপরে উঠে গেছে। অবিচ্ছিন্ন জনস্রোত চলেছে আসা যাওয়া উভয় মুখেই। মুহূর্তের তরেও যাত্রীর বিরাম নেই। এত বেশী জন সমাগম তীর্থ পথের পবিত্র নির্জনতাকে নষ্ট করে একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে গোমুখের সেই স্বর্গীয় নির্জনতার স্বাদ পাবার পর এই হৈ-হট্টগোল কি আর ভালো লাগে ?

সমস্ত পথটাই বড় বড় পাথর দিয়ে গাঁথা। তার ওপর খুরের শব্দ তুলতে তুলতে কদম চালে চলেছে শ'য়ে শ'য়ে ঘোড়া, সওয়ার পিঠে নিয়ে। ঘোড়ার গলায় টিনের ঘন্টি ঠুং ঠাং করে বেজেই চলেছে। এদিক ওদিক দুদিক থেকেই সারি সারি ঘোড়া অবিরাম আসা যাওয়া করছে। পদযাত্রীদের সাবধান হতে হচ্ছে পদে পদে। ঘোড়ায় চড়ে আমরা যারা চলেছি তাদেরও সতর্ক হতে হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। পাশ কাটাবার সময় অন্য ঘোড়ার সঙ্গে কিংবা পাশের পাহাড়ের গায়ে কখনো কখনো ধাক্কা লাগছে, কখনো বা ধাক্কা লাগতে লাগতে বেচে যাচ্ছি।

আমার ঘোড়াটার আবার দেখছি অভ্যেস বড়ো খারাপ। খাদের একেবারে কিনার ঘেঁষে সে চলবে। অন্য অনেক ঘোড়া চলেছে মাঝ পথ দিয়ে অথবা পাহাড় ছুঁয়ে, কিন্তু আমার ঘোড়াটি (আসলে ঘুড়ী) বয়েস মাত্র তেরো বছর হলে কী হবে ভীষণ একগুঁয়ে আর জেদী। নামটি শ্যামা। শ্যামার মালিক যুবক রাম সিং চলেছে সঙ্গে সঙ্গে আমার থলেটি

কাঁধে ফেলে, আর লাঠিটি মুঠি করে। আমরা প্রায় সব জিনিস-পত্তরই রেখে এসেছি গৌরীকুণ্ডে। আমাকে বার বার সোজা হয়ে বসতে বলছে রাম সিং—সাহস দিচ্ছে ভয়ের কোন কারণ নেই, ঘোড়া ঠিকই নিয়ে যাবে। কিন্তু মাঝে মাঝেই পরিচিত ঘোড়াওয়ালার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে রাম সিং দাঁড়িয়ে পড়ছে তার সঙ্গে কথা বলতে। আমার ঘোড়া কিন্তু থামছে না, আমাকে নিয়ে নিজের রোখে এগিয়ে চলেছে সমানে। পেছন থেকে রাম সিং থেকে থেকেই লাঠির বাড়ি মারছে তাকে, সে তখন আচমকা শুরু করছে দৌড়োতে, কখনো কখনো যেন ইচ্ছে করেই হোঁচট খেয়ে পড়ছে পথের ওপর। আমার তখনকার অবস্থাটা কল্পনার চোখে দেখে নিতে নিশ্চয়ই কারো অসুবিধে হচ্ছেনা।

পথের আঁকে বাঁকে পাহাড়ের খাঁজে ভাঁজে বসে রয়েছেন সাধুর দল—খালি গা, ছাই মাখা, বেশীর ভাগই কৌপীন মাত্র সম্বল। ধুনি জ্বলছে। দেব দেবীর মূর্তি অথবা ছবি সামনে রাখা। কেউ বা গাঁজার কল্কেয় দম দিচ্ছেন প্রাণ ভরে। এক বুড়ি চলেছে—লাঠি হাতে, কোমর বাঁকা। এক যুবতী বধূ ফিরে আসছে—মুখটি কাঁদো কাঁদো, আর যেন পারছেনা। বিশাল বপু মাড়োয়ারী স্ত্রী-পুরুষেরা প্রায় সবাই চলেছে ডাণ্ডি হাঁকিয়ে। মাত্র দুজনকে দেখলুম হাঁপাতে হাঁপাতে মন্থর চরণে ফিরে চলেছে কেদারনাথ থেকে। বুড়োবুড়িরা কেউ কেউ চলেছেন কাণ্ডি চড়ে। যাত্রীদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যাই বেশী। রাজস্থান গুজরাট বিহার থেকেও অনেক যাত্রী এসেছেন। রাস্তায় বাঁকুড়ার সেই সাধুটির সঙ্গে আবার দেখা, দেখা হয়ে গেল গোমুখের সেই দুঃসাহসী যুবা সুকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গেও। তারা কেদার দর্শন করে ফিরে চলেছে, চলেছে বদ্রীনাথের দর্শন প্রত্যাশায়।

অপূর্ব দৃশ্যের মাঝখান দিয়ে চলেছি। দুদিকে পাহাড়ের ঢাল, মাঝখানে বয়ে চলেছেন তরঙ্গিনী মন্দাকিনী। সামনে দুই পাহাড় যেখানে মিলে গেল মনে হচ্ছে ঠিক সেই সন্ধিবিন্দুতে মাথা তুলে দাঁড়ালো আর একটি বিরাট পর্বত—বরফে মোড়া, নামটি নীলকণ্ঠ। এই পর্বতের নীচেই কেদারনাথের মন্দির। আজ পর্যন্ত কেউ নাকি তার চূড়োয় উঠতে পারেনি, শিবধাম বলে।

পথে ছোট ছোট কত চটি ছাড়িয়ে এলাম। এখানেও প্রথম চটিটার নাম জঙ্গলচট্টি। কোথাও কোথাও বসে বিশ্রাম নিয়েছি। চা জিলিপী পকৌড়ী খেয়েছি। এখন এসে পড়েছি রামওয়াড়া চটিতে, গৌরীকুণ্ড থেকে সাত কিলোমিটার দূরে। কেদারনাথের পথে এটাই সব চাইতে বড় চটি। লোকজন ডাণ্ডি ঘোড়া খচ্চরে সমস্ত স্থানটি গম্ গম্ করছে। একটা দোকানে বসে ডাল ভাত আর কুমড়োর তরকারি দিয়ে মধ্যাহ্ন আহার সমাধা করলাম। কিছুক্ষণ পরে ঐ দোকানে এসে বসলেন এক দল মহিলা অভিযাত্রিনী, তাঁরা কেদার থেকে ফিরে চলেছেন ঘোড়ায় চড়ে। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে জানা গেল তাঁরা সকলেই শিক্ষয়িত্রী, দল বেঁধে তীর্থ করতে বেরিয়েছেন। কিছুক্ষণ পরে আরও একজন মহিলা (পূর্ববর্তিনীদের পরিচিতা) এসে নামলেন ঘোড়া থেকে, হাঁটতে পারছেন না, খোঁড়াচ্ছেন। শোনা গেল ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়েছিলেন তিনি।

বিশ্রামের পর আবার যাত্রা শুরু হলো। এখনো প্রায় অর্ধেক পথ বাকি। এখান থেকে রাস্তা হঠাৎ ভীষণ খাড়াই হয়ে পাক খেতে খেতে ওপর থেকে আরও ওপবে উঠে গেছে। অনেকে চলেছেন ঘোড়ার পিঠে সার বেঁধে। হঠাৎ দেখি বন্ধুদের দেখা যাচ্ছে ওই ওখানে দু-তিনশো ফুট ওপরে—আরও ওপরে দেখা যাচ্ছে অন্যদের ঘোড়া। ঘুরে ঘুরে পথ চলে গেছে স্বর্গের দিকে। এটাই তো ছিল পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের পথ। ওই দেখছি অনেক নীচে সবুজ পাহাড়ের সঙ্গে মিশে গেছে নীল পাহাড় যেখানে মন্দাকিনীর ফেনিল প্রবাহ আর দেখাই যাচ্ছেনা সেই সেখানে।

পথে পড়লো গোরুড় চট্টি। রামওয়াড়া থেকে গোরুড়চট্টি পর্যন্ত সমস্ত পথটাই সুউচ্চ ধূসর পর্বতের ভেতর দিয়ে চলে এলাম—বড় বড় গাছপালা বড়ো একটা না থাকলেও পথের দুপাশে অজস্র লতাগুল্ম আর সহস্র বর্ণের সুগন্ধ ফুলের সে কী বিস্ময়কর সমারোহ। এক জায়গায় গাছভর্তি সুন্দর সাদা সাদা গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ফুটে থাকতে দেখে ডঃ চৌধুরী উল্লসিত হয়ে বলে উঠলেন—কাঞ্চন গোলাপ। দেখা হলেই পরস্পরকে সম্ভাষণ জানিয়ে

যাত্রীরা সোল্লাসে জয়ধ্বনি করে উঠছেন—জয় কেদারনাথ জী কী জয়, কেউ বা আবার বলছেন—বোম্ শঙ্কর, হর হর হর হর।

এইবার কেদারনাথের কাছাকাছি এসে পড়েছি। বেলা এখন সোওয়া দুটো। ঠাণ্ডা বাড়তে বাড়তে প্রায় সর্বাঙ্গ হিম হয়ে আসছে। যত পাহাড় চোখে পড়ছে সবই বরফে মোড়া। সামনে চেয়ে দেখি চারপাশে পাহাড়, মাঝখানে একটি উপত্যকা। এই উপত্যকাতেই কেদারনাথের মন্দির। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কেদারনাথের উচ্চতা প্রায় ১১৫০০ ফুট। ঐ, মন্দিরের চূড়ো দেখা যাচ্ছে। আশেপাশে বেশ কিছু ঘরবাড়ি—ট্রাভেলার্স লজ, যাত্রীদের বিশ্রাম গৃহ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের আশ্রম, ভজন আশ্রম, পাণ্ডাদের বাড়ি ঘর, সামান্য কিছু দোকানদানিও গড়ে উঠেছে। এখানে পাহাড়ের ওপর একটাও বড় গাছ নেই—বিরাট বিরাট কালো রঙের পাথরের চাঁই সারা উপত্যকাময় ইতস্ততঃ ছড়ানো, বাকি অংশটুকু সবুজ ঘাসে ঢাকা। মাঝে মাঝে তির্ তির্ করে ঝর্ণার ক্ষীণ জলধারা নেমে আসছে পাহাড় চূড়ো থেকে। জলধারার দুপাশে অজস্র হলুদ আর নীল রঙের ফুল ফুটে চতুর্দিক আলো করে আছে। লঙ্কা থেকে ভৈরোঁঘাটির পথে এক জায়গায় এই রকম এক রাশ হলুদ রঙের ফুল ফুটে থাকতে দেখেছিলাম—দেখতে অনেকটা ড্যাফোডিল ফুলের মতো, বড় বড় গাছের তলা আলো করে ফুটে ছিল তারা। ওখানে এই ফুলগুলোকে ওরা বলে বেথী। নীল রঙের ফুলগুলোর নাম জানিনা। বিরাট বিরাট লোমওয়ালা দু-তিনটে কুকুর পড়লো চোখে, তার মধ্যে একটা দেখতে ঠিক যেন ভালুকের মতো। দু-তিনটে শালিক আর একটা দাঁড়কাকও চোখে পড়লো। পাহাড়ের তলায় গোটা চারেক নধর মোষ চরে বেড়াচ্ছে। জায়গাটা বনময় হলে আর এত উঁচু না হলে এখানে সিংহও থাকতে পারতো। এ জায়গাটাকে ভূ-গঠনের দিক দিয়ে অনেকটা গির অঞ্চলের মতো মনে হচ্ছে।

কেদারনাথ পৌঁছে যেই ঘোড়া থেকে নেমেছি অমনি শুরু হয়ে গেল প্রবল তুষারপাত আর মেঘের গুরু গুরু গরজন। মেঘের গুরু গুরু শব্দ পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে গম্ গম্ করে বাজতে লাগলো। যেন

"অম্বরে ডম্বরু বাজিছে ঐ"—কেদারেশ্বর মহেশ্বরের প্রলয় ডম্বরু ওই বা বুঝি বাজছে। বর্ষাতি বের করবারও সময় পেলাম না, ভিজে গেলাম।

তোমার করুণা ধারা এমনি করে অবিরাম ঝরে পড়ছে, কিন্তু সারা অঙ্গে অহংকারের বর্ষাতি জড়িয়ে বসে আছি, তাই তার অমৃত স্পর্শটি উপলব্ধি করতে পারছি না। দয়া করে আমার সেই বর্ষাতিটা চিরকালের মতো কেড়ে নাও ঠাকুর, তোমার অপার করুণার আনন্দধারায় আমাকে পরিসিক্ত কর।

দৌড়োতে দৌড়োতে একটা পান্থশালার খোলা বারান্দার তলায় এসে আশ্রয় নিলাম। বৃষ্টি থামলে সোজা চলে এলাম ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের আশ্রমে। এখানে রয়েছেন দুই ব্রহ্মচারী, দুজনেই যুবক। প্রধান যিনি তাঁর নাম ব্রহ্মচারী মাধব। ব্রহ্মচারী সাদরে আমাদের আপ্যায়ন করলেন। আশ্রয় দিলেন দোতলার ওপর। আমাদের চারজনের জন্য একটা পুরো ঘরই ছেড়ে দিলেন। সেই ঘরের খোলা জানালার পাশে বসে লিখছি। জানালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটি পাহাড়, মাথায় তার বরফ। পাহাড়ের খানিকটা ছায়ায় কালো, বাকিটা আলোয় আলো হয়ে আছে। চারিদিকে বিরাজ করছে একটি প্রগাঢ় প্রশান্তি। শুধু শুনতে পাচ্ছি মন্দাকিনীর গুরু গুরু নিনাদ। সন্ধ্যে হয়ে এলো। মন্দিরে এবার আরতি শুরু হবে কে যেন এসে জানান দিয়ে গেল।

বাতাসে ভেসে আসছে কাঁসরঘন্টার অস্ফুট ধ্বনি। এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কিন্তু বাইরে বেরোতে আর ইচ্ছে করছে না। কাল সকালেই বাবা কেদারনাথকে দেখলে চলবে। আশ্রমের নীচের তলায় একটা ঘর নিয়ে একজন লোক একটা দোকান দিয়েছে। সে যাত্রীদের জন্য গরম জল চা গরম গরম খাবার অর্ডার দিলে সরবরাহ করে। আমাদের কাছে এসে অর্ডার নিয়ে গেছে, ইতিমধ্যে গরম জল এবং চা দিয়েও গেছে, খাবার দেবে রাত্রি সেই সাড়ে আটটা নাগাদ—ভাত ডাল আর পাঁচমিশালী একটা তরকারি। আমার বন্ধুরা এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমিই একা লিখে চলেছি। এক সময় একজন ভদ্রলোক ঢুকলেন আমাদের

ঘরে, বললেন তিনি আশ্রমের পাণ্ডা শ্রীপান্নালাল শুক্লা, ব্রহ্মচারী তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাদের সঙ্গে মন্দিরে পুজো দেওয়ার ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করতে। সব্বাইকে ডেকে তুললাম। সকলের থেকে শুক্লাজী বংশতালিকা জেনে নিয়ে নথিভুক্ত করে রাখলেন। কে কতো টাকার পুজো দেবো জেনে নিয়ে বললেন আগামীকাল সকাল ছ'টা নাগাদ মন্দিরে চলে যেতে, সেখানে তিনি থাকবেন আমাদের অপেক্ষায়। তিনি বিদায় নেবার কিছুক্ষণ পরেই খাবার নিয়ে এলো। গরম খাবারটি পরম তৃপ্তির সঙ্গে উদরস্থ করে গরম জলে হাত মুখ ধুয়ে উষ্ণ শয্যার কোলে ডুব দিলাম।

কাল অনেক রাত্তিরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। জানালার পাশে শুয়েছিলাম। কাঠের জানালা, ঠিক মতো লাগেনা, ছিটকিনি নেই, এক টুকরো পাথর ঠেস দিয়ে কোনক্রমে বন্ধ করা হয়েছে। হঠাৎ জানালাটা একটু বেশী ফাঁক হয়ে গিয়ে হুড়মুড় করে এক রাশ ঠাণ্ডা বাতাস ঘরের মধ্যে ঢুকে আছড়ে পড়লো আমার মুখের ওপর। তারই ছোঁয়া লেগে ঘুম গেল ভেঙে। চেয়ে দেখি জানালার ফাঁক দিয়ে এক ঝলক জ্যোৎস্না ঢুকেছে ঘরের ভেতর, দেয়ালে পড়ে ঝিকমিক করছে। জানালা ফাঁক করে দেখি মাঠময় জোছনা ঠা ঠা করছে, জানালার ফাঁক দিয়ে যে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে তার মাথায় বরফের ওপর জোছনা পড়ে কী অদ্ভুত যে লাগছে! কানে কানে কে যেন বলে গেল—না, না, এখন আর ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে নয়, বেরিয়ে পড় ঘরের বাইরে, জ্যোৎস্না-সিন্ধু-জলে স্নান করে এসো। ধীরে ধীরে জানালা বন্ধ করে সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে আশ্রমের বাইরে উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে দাঁড়ালাম। চারিপাশ নিঃঝুম নিস্তব্ধ, বিশ্বচরাচর সুপ্তিমগ্ন। উন্মুক্ত প্রান্তরে আমি একা দাঁড়িয়ে, মাথার ওপর অন্তহীন আকাশ। কালকের তুষারপাতের পর আকাশ আজ সম্পূর্ণ পরিষ্কার, কোথাও এক ফোঁটা মেঘ নেই, কুয়াশা নেই।

আকাশভরা কোটি কোটি তারার অজস্র তন্দ্রালু আলোয় মহাশূন্য আচ্ছন্ন হয়ে আছে। চাঁদ উঠেছে—দেখে মনে হলো পূর্ণিমা আর খুব বেশী দূরে নয়। বরফাবৃত পাহাড়ের মাথায় সোনালী চাঁদ! এ যে এক স্বপ্নলোকে এসে পড়েছি দেখছি। যতদূর দৃষ্টি যায় ঝকঝকে জ্যোৎস্নায় বিশ্বনিখিল ঝলমল করছে! বিস্মিত পুলকে চোখ যেন আর বন্ধ হতে চাইছে না। ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি হতে শুনেছি, ঝুপ্ ঝুপ্ করে তুষার পড়তে দেখেছি, কিন্তু আর কখনো এমন নিঃশব্দে অঝোর ঝরে জ্যোৎস্না ঝরতে দেখিনি। চারিপাশে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় বরফে আর জোছনায় মধুর কানাকানি চলেছে—মনে হচ্ছে যেন বরফের গা বেয়ে অজস্র ধারায় জ্যোৎস্নার স্রোত নেমে আসছে হলুদ প্রান্তরে। মন্দাকিনীর জলে জ্যোৎস্না ভাসছে। অঢেল জ্যোৎস্নায় দিক্ দিগন্ত ভেসে যাচ্ছে। কানে কানে আবার কে যেন বলে দিলে—দেখে নাও, দুচোখ ভরে দেখে নাও, এরই নাম কেদার জ্যোৎস্না, এ ধন আর কোথাও মিলবে না, কেদার জ্যোৎস্নায় তোমার প্রাণ মন কানায় কানায় ভরে নাও। এক অসহ্য সুখানুভূতিতে বুক যেন ভেঙে পড়ছে, আনন্দ যেন আর বইতে পারছি না, অথচ এক মুহূর্তের জন্যও মন চাইছে না এই আনন্দানুভূতি থেকে স্খলিত হতে। কিন্তু প্রচণ্ড শীতে শরীর প্রায় হিম হবার উপক্রম। তাই ধীরে ধীরে আবার এসে শয্যার কোলে আশ্রয় নিলাম। কেউ জানতেই পারলো না কী অপূর্ব এক অভিজ্ঞতা কী দুর্লভ এক উপলব্ধি ঘটে গেল আমার জীবনে লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ অন্তরালে।

আজ ভোরে সাত তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙে উঠে যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে হাজির হোলাম মন্দির প্রাঙ্গণে। পাথর দিয়ে তৈরী মজবুত মন্দির, বাঁধানো প্রাঙ্গণ ঝকঝক করছে। সাড়ে ছ'টা বাজতে না বাজতেই বিরাট ভিড় জমে গেছে মন্দির অঙ্গনে। সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে সবাই। একে একে এক পথ দিয়ে মন্দিরে ঢুকছে আর এক পথ দিয়ে বেরিয়ে আসছে। একটা বিশেষ জায়গা পর্যন্ত এগিয়ে জুতো খুলে রাখতে হয়। এই সীমানার পর চামড়ার তৈরী কোন কিছুই আর সঙ্গে নেওয়া যাবেনা।

খালি পায়ে, এমন কি মোজা পরেও সেই ঠাণ্ডা প্রাঙ্গণে একটানা দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সকলেই তাই লাফাতে শুরু করে দিয়েছে, এইভাবে চেষ্টা করছে পালাক্রমে পা দুটোকে উঠোনের তীক্ষ্ণ শীতল স্পর্শ থেকে ক্ষণিকের জন্যও রেহাই দিতে, আর শরীরটাকেও একটু গরম করে তুলতে। কিছুক্ষণ পরে সূর্যের এক ঝলক আলো এসে পড়লো আমরা যেখানটায় দাঁড়িয়েছি তার থেকে একটু দূরে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই আলোটুকু গায়ে মেখে নেবার জন্য সকলের মধ্যে যেন রীতিমত কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। আমার ঠিক সামনেই একটি চোদ্দ পনেরো বছরের মাড়োয়ারী কিশোর শীতে হি হি করে কাঁপছে, আর বীর বিক্রমে অবিরাম লাফিয়ে চলেছে। কিছুক্ষণ পরে তার বাবা মা আর এক ফোঁটা একটা বোন এসে ওর আর আমার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লো। শুনলাম ওর বড় বোনটা অসুস্থ হয়ে পড়েছে, মা বাবা তাই তাকে কাছাকাছি কোনো এক জায়গায় রেখে আসতে গিয়েছিলেন। ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা এবং ছেলেমেয়ে সকলেরই পরণে গরম ট্রাউজার, গরম পুলোভার, কোট, তাছাড়া সর্বাঙ্গে আরও অনেক উষ্ণ আচ্ছাদন। ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা, বিশেষ করে ভদ্রলোক খুবই বাকপটু এবং কথা বলতে সদাই উৎসুক। কলকাতায় থাকেন, বিরাট পাটের ব্যবসা, মোটামুটি বাংলাভাষা বলতে পারেন। হৃষীকেশ থেকে গৌরীকুণ্ড সমস্ত পথটাই ট্যাক্সি করে এসেছেন, সেখান থেকে কেদারনাথ এসেছেন কাণ্ডি আর ঘোড়ায় চড়ে। ছোট্ট মেয়েটাও নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাই পকেট থেকে ব্রাণ্ডির শিশি বের করে মেয়েকে এরই মধ্যে বার দুই খেতে দিলেন। পার্শ্ববর্তী একজন যাত্রী ইঙ্গিতে একটু কটাক্ষ করে ক্ষীণ কণ্ঠে মন্তব্য করলেন—কেদারনাথে এসে কেদারেশ্বরের মন্দির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়েও ব্রাণ্ডি! গাঁজাখোর কেদারেশ্বর কিন্তু কোন রকম প্রতিবাদ করলেন না, তাঁর বিরক্তিও কোনভাবে প্রকাশ পেলোনা বিন্দুমাত্র। আমরা গোমুখ অবধি গিয়েছিলাম শুনে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আমাদের দিকে সসম্ভ্রমে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন। তাঁদের ধারণা গোমুখ থেকে যারা ফিরে আসে তাদের দেখলেও পুণ্য হয়।

লাইন কিন্তু বড়ো ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় সমস্ত লাইনটাই যেন জমে গেছে। নিজেদের চাঙ্গা করে নেবার জন্য দেহাতী মহিলা যাত্রিনীরা সমস্বরে কেদারনাথের জয়গাথা সুর করে গাইতে শুরু করে দিয়েছেন—একই সঙ্গে ভক্তি নিবেদন, দেহমনের উদ্দীপন এবং সময় অতিবাহন সবই চলছে। এক সময় আমাদের পালা এলো মন্দিরে ঢুকবার। ইতিমধ্যে শুক্লাজী কয়েকবারই আমাদের সঙ্গে দেখা করে গেছেন। এবার তিনি সবাইর হাতে গঙ্গাজল দিয়ে ভোগের ডালি ধরিয়ে দিলেন। তারপর ভিড় ঠেলে আমাদের নিয়ে চললেন মন্দিরের ভেতর।

মন্দিরের ঠিক সম্মুখের চত্বরে বিরাট এক বৃষভ মূর্তি। মন্দিরে উঠেই দরজার সামনে দেখা মিলবে বিশালকায় গণেশ মূর্তির। তাঁকে পূজো না দিয়ে ঢুকবার জো নেই। মন্দিরে ঢুকেই মা দুর্গার মূর্তিকে প্রণাম করে মহেশ্বর দর্শনে এগিয়ে যেতে হবে। মন্দিরের মাঝখানে প্রশস্ত চত্বরে কেদারেশ্বর স্বমহিমায় বিরাজ করছেন। তাঁকে ঘিরে চতুর্দিকে যাত্রীদের নিয়ে পাণ্ডারা হৈ হৈ শুরু করে দিয়েছে—এই মন্ত্র বল, শিবের গায়ে ঘি মাখিয়ে ফুল বেলপাতা চড়াও, চন্দন ঘষে দাও, এই খানটায় ধূপ জ্বালো। কথাবার্তা বিধি-নির্দেশ মন্ত্রোচ্চারণ, ভক্তবৃন্দের বৃন্দ জয়ধ্বনি, সরব আকুল আর্ত প্রার্থনা : ধূপ ধুনো, ফুল বেলপাতা ঘি চন্দনের মিশ্র গন্ধ, স্নিগ্ধ দীপালোক, বিজলীর রোশনাই সব কিছু মিলিয়ে সে এক আশ্চর্য পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয়েছে—মন্দিরের ভেতরের জগৎ আর বাইরের জগতে আকাশ পাতাল তফাৎ। আমরাও কেদারনাথের গায়ে ঘি মাখিয়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম। স্পর্শটি কী স্নিগ্ধ, কী সুন্দর, আর কী রোমাঞ্চকর! সমস্ত মনপ্রাণ এক গভীর অনেন্দ আর নির্মল শান্তিতে কানায় কানায় ভরে গেল।

কেদারনাথ মহাদেব লিঙ্গ মূর্তি নন, বিরাট এক প্রস্তর খণ্ড, মাটি ফুঁড়ে উঠেছেন, দেখতে অনেকটা ষাঁড়ের কুঁজের মতো। কথিত আছে পাণ্ডবেরা যুদ্ধে জয়লাভ করার পর আত্মীয় হননের পাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে মহাদেবের আশীর্বাদ প্রার্থী হয়ে বারাণসীতে গেলে মহাদেব তাঁদের দেখা

না দিয়ে ছদ্মবেশে গুপ্তকাশীতে পালিয়ে যান। পাণ্ডবেরা গুপ্তকাশী পর্যন্ত ধাওয়া করে তাঁকে চিনে ফেললে তাঁদের কাছে ধরা না দিয়ে মহাদেব আবার পালিয়ে যান কেদারনাথে। সেখানে তিনি বৃষরূপ ধারণ করে অন্যান্য গো-মহিষের দলে ভিড়ে যান এবং সবুজ প্রান্তরে বিহার করতে থাকেন। পাণ্ডবেরা টের পেয়ে হাজির হন কেদারনাথে। দুই পর্বতশৃঙ্গে দুই পা রেখে দ্বিতীয় পাণ্ডব মহাপরাক্রমশালী ভীম খুঁজতে থাকেন মহাদেবকে। বৃষরূপী মহাদেব ছাড়া অন্যান্য সকল গো-মহিষ ভীমের দুই পায়ের তলা দিয়ে ভয়ে পালিয়ে যায়। ভীম তখন মহাদেবকে চিনতে পেরে দ্রুত বেগে নেমে আসেন তাঁকে ধরতে। বৃষরূপী মহাদেবও পাতালে প্রবেশ করতে থাকেন। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ অদৃশ্য হবার আগেই ভীম তাঁর কুঁজটি জড়িয়ে ধরেন। মহাদেব পাণ্ডবদের ভক্তি এবং অধ্যবসায়ে খুশী হয়ে তাঁদের দেখা দেন এবং আশীর্বাদ করেন। তাঁরই নির্দেশে তখন থেকে কেদারনাথে তাঁর পূজোর প্রচলন হয়। আরও কথিত আছে বৃষরূপী মহাদেবের মুখটি গিয়ে বেরিয়েছে নেপালে—পশুপতিনাথের মন্দির তৈরী হয়েছে যেখানে সেইখানে।

এই কাহিনীর সত্যাসত্য বিচার করতে যাবার প্রয়োজন কী? বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহু দূর। বুদ্ধি দিয়ে যা অসম্ভব মনে হয় ভক্তির জোরে তাই তো ঘটে চলেছে কত লোকের জীবনে। তোমার সীমাবদ্ধ বুদ্ধির গুমর ত্যাগ করে বিশ্বাস করতে শেখ—

ডুব দে রে মন কালী বলে
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে
রতন মাণিক্য কত পড়ে আছে সেই জলে
রামপ্রসাদ বলে ঝম্প দিলে
মিলবে রতন ফলে ফলে।

* * * *

সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত
অভাবে কি ধরতে পারে।

তাছাড়া সাহিত্য-মানের বিচারেও কাহিনীটি নিঃসন্দেহে রসোত্তীর্ণ। তার রসটি আস্বাদন করি না কেন?

মন্দিরে পুজো দেবার পর বাইরে বেরিয়ে কিছু কেনা কাটা করলাম স্মারক চিহ্ন করে রাখার জন্য। কলকাতা থেকে আসবার সময় এক বন্ধু অনুরোধ করেছিলেন তাঁর জন্য একটি খাঁটি রুদ্রাক্ষের মালা নিয়ে যেতে। কিনলাম একটি। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল রুদ্রাক্ষের আকার যত ছোট হবে তার দামও হবে তত বেশী। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রুদ্রাক্ষের মালা দেখালো। পাঁচ-ছশো টাকা পর্যন্ত দাম। বললো আরো দামী মালাও হয়। বড় ছোট সব রুদ্রাক্ষই খাঁটি হতে পারে, কিন্তু ছোট রুদ্রাক্ষ বেশী মেলেনা বলেই তার দাম বোধ করি এত বেশী। অথবা জানিনা তার সঙ্গে সাধন ভজনের কোন নিগূঢ় রহস্য জড়িয়ে আছে কিনা। তবে, যে সচ্চিদানন্দ ঘনীভূত হয়ে বহু হয়েছেন সর্বব্যাপী তাকে আস্বাদন করতে হলে স্থূল থেকে সূক্ষ্মে যেতেই হবে নিগূঢ় সাধনার বলে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর জগতে ক্রমান্বয়ে উত্তরিত হতে হতে সাধক একদিন পৌছে যাবেন সব কিছুর মূলীভূত কারণ সেই আদ্যাশক্তিতে, অণ্ডের মধ্যে তখন দেখবেন তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে, পরমাণুর মধ্যে খুঁজে পাবেন পরমব্রহ্মকে।

কেদারেশ্বর দর্শন করে গৌরীকুণ্ড হয়ে সোজা চলে এসেছি শোন-প্রয়াগে। কেদারনাথ থেকে গৌরীকুণ্ড আসবার পথে এক জায়গায় দেখলুম বাঁকুড়ার সেই সাধুটি অসুস্থ হয়ে পথের ধারে পড়ে আছে---পাশে এক টুকরো কাপড় পাতা, তার ওপর কিছু কিছু পয়সা জমেছে। কোথা থেকে এক সন্ন্যাসিনী এসে জুটেছে তার পাশে।

শোনপ্রয়াগ থেকে কাল ভোরে বদ্রীনাথ যাত্রা করার কথা। কিন্তু একেবারেই হতাশ হতে হলো। আসন্ন বিধান সভা নির্বাচনের জন্য সরকার প্রায় সমস্ত বাসই নিয়ে নিয়েছেন। যাত্রীদের খাতায় নাম রেজিষ্ট্রী করা হলো কিন্তু বাস কবে পাওয়া যাবে তার হদিশ কেউ দিতে পারলোনা। আমাদের মতো আরও অনেক যাত্রী তাঁরাও আটকে পড়েছেন শোন প্রয়াগে। চেষ্টা করলুম যদি ট্যাক্সি পাওয়া যায়, তাহলে

ট্যাক্সি করেই না হয় বদ্রীনাথ হয়ে হৃষীকেশ ফিরে যাবো ২৯শা মে'র আগে, কারণ সেদিনই সন্ধ্যেবেলায় আমাদের রেলের রিজার্ভেসন হয়ে আছে হৃষীকেশ থেকে। কিন্তু ট্যাক্সিও মিললোনা, সব কটাই আগে থেকে ভাড়া হয়ে গেছে। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে না থেকে ঠিক করলাম বদ্রীনাথ দর্শন করে আর তবে কাজ নেই, হৃষীকেশেই ফিরে যাওয়া যাক। ভাগ্যক্রমে হৃষীকেশ ফিরবার জন্য বাসের টিকিটও মিলে গেল।

কাল ভোর চারটেয় বাস ছাড়বে। পাশেই একটা ছোট্ট পাহাড়ের কোলে পাথর কেটে তৈরী হয়েছে নিভৃত একটি পান্থনিবাস, কোন রকমে মাথা গুঁজবার নামমাত্র আস্তানা। রাত্তিরের মতো সেখানেই ঠাই করে নিয়েছি। সামনে বাস ট্যাক্সির স্ট্যাণ্ড, তার ওপাশে সারি সারি চালা ঘরে সারিবদ্ধ হোটেল, তারও ওপারে গভীর অরণ্যাচ্ছন্ন শৈলমালার সানুদেশে মন্দাকিনী আর শোন গঙ্গার দ্বিবেণী সংগম, কল কল সংগীতের ঝংকার শুনতে পাচ্ছি।

শান্তির ঠোঙায় মোড়া ছোট্ট একটি গ্রাম শোন প্রয়াগ!

আজ ভোর চারটেয় শোন প্রয়াগ থেকে যাত্রা করে বেলা একটায় এসে পৌঁছোলুম হৃষীকেশে। পথে পড়লো একটি নতুন তীর্থ, নাম দেব প্রয়াগ। গোমুখ থেকে ভাগীরথী আর শতপন্থ থেকে অলকানন্দা এসে এখানে মিলিত হয়ে নাম নিয়েছেন গঙ্গা। তাই দেবপ্রয়াগকে বলা হয় গঙ্গার জন্মভূমি। আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের বিচারে প্রয়াগের পরেই দেব প্রয়াগের স্থান। পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঘরবাড়ি দেবালয় থরে থরে বিন্যস্ত। দুপাশ থেকে দুই নদী হাত ধরাধরি করে দেবপ্রয়াগকে ঘিরে রেখেছেন। উঁচু রাস্তা থেকে নীচের এই নয়নানন্দকর দৃশ্যটি দেখতে ভারি চমৎকার

লাগছিল। সারা দেবপ্রয়াগকে বেষ্টন করে যেন বিরাজ করছে সে এক স্বর্গীয় প্রশান্তি।

প্রায় সমস্ত পথটা জুড়েই বাসের মধ্যে তিন বুড়ি একই সঙ্গে তারস্বরে একই সুরে অবিশ্রান্ত গান গাইতে গাইতে এলো। গোটা সাত আট গানই ঘুরে ফিরে গাইছিল তারা। তার মধ্যে "ও গোপালা, রে গাড্ডি বালা, ধীরসে তেরা গাড্ডি চালা, মেরা ডর লাগে" থেকে আরম্ভ করে "ক্যা দেখো দরপনমে রে মুখুড়া, তের দয়া ধরম নেহি মনমে" পর্যন্ত সকল রকম ভাবেরই গান ছিল। বুড়িদের অদম্য উৎসাহ প্রাণপ্রাচুর্য আর বিস্ময়কর স্মরণ শক্তির তারিফ না করে পারা যায় না। হিমালয় ছাড়িয়ে যখন বাস নেমে এল হৃষীকেশের সমতল ভূমিতে শুধু তখনই তারা গান থামিয়ে নীরব হলো।

হিমালয়, এবার সত্যি সত্যি তোমাকে ছেড়ে চললাম। তোমার সেই নিত্য নব রূপৈশ্বর্য আর আমার চোখে পড়বেনা, তোমার গভীর সরস পবিত্র উদার সান্নিধ্য আর আমি পাবোনা, তোমাকে নিবিড় করে প্রত্যক্ষভাবে পাবার পালা আমার ফুরোলো। আমি ফিরে চললাম শ্বাসরোধকারী কৃত্রিমতাকীর্ণ শহুরে জীবনের রসকসহীন নিত্যনৈমিত্তিকতার মাঝখানে, যেখানে প্রচণ্ড স্বার্থবুদ্ধির ভয়ানক দম্ভ আর আত্ম-প্রবঞ্চনার নিখুঁত নৈপুণ্য মানুষকে অন্ধ করে রেখেছে, সহজ সত্যকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তার দৃষ্টিপথ থেকে; দৃষ্টির স্বচ্ছতা হারিয়ে সে শুধু সত্যকে হারায়নি, তার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়েছে শিবম্ এবং সুন্দরম্-কেও, সৌন্দর্য উপভোগ করতে ভুলে গেছে সে, বিস্মৃত হয়েছে পরস্পরের সঙ্গে সুন্দর শোভন আচরণ করতেও, ভুলেছে তার পক্ষে যা প্রকৃত কল্যাণকর তাকে চিনে নিয়ে বরণ করতে; ফিরে চললাম সেই শ্বাসরোধকারী পরিবেশের মধ্যে। কিন্তু তবু আমি গাঢ় অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পাচ্ছি জ্যোতির্ময়কে। আর সে জ্যোতির্ময় হলে তুমি। আমি নিশ্চয় জানি এই মুহূর্ত থেকে আমার জীবনের ওপর তুমি তোমার সক্রিয় প্রভাবটি বিস্তার করে চলবে, জীবন্ত অতীত হয়ে প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রণ করবে আমার সমস্ত

বর্তমান আর ভবিষ্যৎকে। তোমার কাছে প্রার্থনা জানাই কবির কবিতার সামান্য রদ বদল করে—

তব সঞ্চার শুনিব আমার মর্মের মাঝখানে
এ কয়দিনের যত সঞ্চয় রেখে যাও মোর প্রাণে।

এ কয়দিন প্রতি মুহূর্তে তোমার সান্নিধ্যে এসে আমার বুকের মধ্যে যে নিবিড় আনন্দানুভূতিটি টল্ টল্ করছে আশীর্বাদ কর, হে মহান সুন্দর হিমালয়, যেন আগামী দিনে সর্ব সময়ে সর্ব অবস্থায় সেটি আমার অন্তরে অটুট হয়ে বিরাজ করে। জানি মাঝে মাঝে বাস্তবের রূঢ় আঘাতে আমার বীণার তারটি ছিড়ে ছিঁড়ে যাবে, তবু আশীর্বাদ কর যেন পারি সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ধার করে তোমার দেওয়া এই আনন্দ মিড়ের মূর্ছনায় নতুন করে আবার তাকে অনুরণিত করে তুলতে!